উসূলুল ফিকহ

ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি

শাহ আবদুল হান্নান

উসূলুল ফিক্‌হ্‌

ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের মূলনীতি

মূল

শাহ আবদুল হান্নান

অনুবাদক

ড. ওয়াসিম হক

www.pathagar.com

উসূলুল ফিক্‌হ্‌
ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের মূলনীতি

মূল : শাহ আবদুল হান্নান

অনুবাদক : ড. ওয়াসিম হক

গ্রন্থস্বত্ব : দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস

প্রকাশক : শেখ সাদী
৬০/ই পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৯১৩ ৪০০ ৯৭৫

প্রকাশকাল : জানুয়ারি ২০১১

পরিবেশক :
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
বাড়ি নং : ০৪, রোড নং : ০২, সেক্টর : ০৯, উত্তরা, ঢাকা- ১২৩০
ফোন : ৮৯৫-০২২৭, ৮৯২-৪২৫৬, ০৬৬৬২-৬৮৪-৭৫৫

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ :
আবদুল্লাহ আল মামুন

মুদ্রণ : চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ
১৩১ ডি,আই,টি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯১১৪৪১৩৫৯

মূল্য : ১২০ টাকা

ISBN : 978-984-33-2353-X

Usul-Al-Fiqh by Shah Abdul Hannan, transtaled by Dr. Wasim Haque and pulished by Sheikh Sadi, 60/E Purana Paltan, Dhaka-1000. Price:100/-, US $5.00.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

দি পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস-এর পক্ষ থেকে এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দবোধ করছি। মূল বইয়ের নাম 'উসূলুল্ ফিকহ'- যার অর্থ ইসলামী আইনের উৎস এবং উৎস থেকে আইন প্রণয়নের পদ্ধতিসমূহ। 'উসূলুল ফিকহ'-এর জ্ঞানের কি প্রয়োজন তা গ্রন্থাকার জনাব শাহ আবদুল হান্নান এ গ্রন্থে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

আমরা যতটুকু জানি জনাব শাহ আবদুল হান্নান ২০ বছরেরও অধিক সময় ধরে উসূলুল্ ফিকহর উপর পড়াশুনা করেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ল্যাসিক ও আধুনিক বই পর্যালোচনা করেছেন যার উল্লেখ মূল গ্রন্থে পাওয়া যাবে। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম কয়েকজন লেখক যারা মূল উসূলুল্ ফিকহর উপর ইংরেজিতে বই লিখেছেন তাদের বই পর্যালোচনা করেছেন। পাইওনিয়ার ও দি উইটনেস মনে করে ইসলামী শরীয়াহ-এর বিধিবিধান সুষ্ঠভাবে অনুধাবন করার জন্য Usul al Fiqh (Islamic Jurisprudence) ইংরেজি বইটির বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন।

বইটি ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন গবেষক ও লেখক ড. ওয়াসিম হক। বইটির মূল লেখক শাহ আবদুল হান্নান অনুবাদটি দেখে দিয়েছেন। তদুপরি তিনজন শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ ডঃ হারুন আর রশীদ, প্রভাষক মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা এবং জনাব মোখলেছুর রহমান, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল যত্নসহকারে দেখে দিয়েছেন যাতে বইটিতে কোনো প্রকার নীতিগত ভুল না থাকে। জনাব হারুন আর রশীদ দেওবন্দ মাদরাসা থেকে ইফতা (ফতোয়া বিভাগ) বিশেষজ্ঞ হিসাবে সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি লাভ করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম (ঢাকা ক্যাম্পাস)-এর প্রভাষক মুহাম্মদ সিরাজুল মাওলা কামিল (১ম শ্রেণী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. (অনার্স) ১ম শ্রেণী, এম. এ. (আরবী)১ম শ্রেণীতে ১ম। অন্যদিকে জনাব মোখলেছুর রহমান মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ করার পরে বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের সকল ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড-এর সেক্রেটারি জেনারেল। এই বই প্রকাশে অন্য যারা গভীর পরিশ্রম করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে পাইওনিয়ারের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল কবি

www.pathagar.com

ওমর বিশ্বাস। এ ছাড়াও পাইওনিয়ারের অন্যান্য সহকর্মীরাও এ ব্যাপারে অবদান রেখেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইংরেজী বই থেকে অনুবাদ করায় নানাবিধ ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কারো দৃষ্টিতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী মুদ্রণে আমরা তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

আমরা পাইনিওয়ার ও দি উইটনেস-এর উপদেষ্টা জনাব শাহ আবদুল হান্নান-এর ইংরেজী বইটির অনুবাদ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

সভাপতি

(মোঃ হাবিবুর রহমান)
দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১. উসূলুল ফিকহ : ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি ০৯
২. কোরআন ১২
৩. সুন্নাহ ১৬
৪. কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা ২১
৫. আদেশ, নিষেধাজ্ঞা এবং রদ ৩০
৬. ইজমা ৩৩
৭. কিয়াস ৩৫
৮. ইসলামী শরীয়াহ পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্ট আইন ৩৯
৯. সাহাবীদের ফতোয়া ৪০
১০. ইসতিহসান ৪২
১১. মাসলাহা মুরসালাহ্ ৪৪
১২. উরফ এবং ইসতিসহাব ৪৬
১৩. সাদ্ আল যারাই ৫০
১৪. হুকুমে শারঈ ৫২
১৫. তাআ'রুদ্ব ৫৭
১৬. ইজতিহাদ ৫৯
১৭. পরিভাষা ৬২
১৮. গ্রন্থপঞ্জি ৬৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উসূলুল ফিক্‌হ্‌
ফিকহ্‌ শাস্ত্রের মূলনীতি

প্রাথমিকভাবে বলা যায় 'উসূলুল ফিক্‌হ্‌' (أُصُولُ الْفِقْه) ইসলামী আইনের উৎস বা ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করে। অবশ্য 'নূরুল আনোয়ার' গ্রন্থে লেখক শেখ আহমেদ ইবন আবু সাঈদ, (যিনি মোল্লা যিওয়ান নামে খ্যাত এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের গৃহশিক্ষকও বটে) উল্লেখ করেন যে, একদল আইনবিদের মতে 'উসূলুল ফিকহ (أُصُولُ الْفِقْه) ইসলামী আইন ও আইনের উৎস দুটো বিষয় নিয়েই আলোচনা করে।

'উসূলুল ফিকহ' (أُصُولُ الْفِقْه)। উসুল (أُصُوْل) হলো (أَصْلٌ) আছল এর বহুবচন] হলো ইসলামী আইনের ভিত্তি। এই শাস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী আইনের উৎস থেকে আইন প্রণয়নের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। এই অর্থে উসুল হলো পদ্ধতি এবং ফিকহ হলো এর উপজাত বা ফল। সুতরাং উসূলুল ফিকহ্‌ হল ইসলামী আইন বা শরীআহর মূলনীতি। (Principles of Islamic Jurisprudence)

উসুলে ফিকহ ইসলামী আইনের প্রাথমিক উৎস কোরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ উসুল কোরআন ও সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করে। আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে উসুল কোরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন শব্দ 'বিশেষভাবে' এবং আরবি ভাষা 'সাধারণভাবে' পর্যালোচনা করে থাকে। যেমন—পর্যালোচিত শব্দের কতিপয় হলো :

'আম' (عَام-সাধারণ)

'খাস' (خَاص-বিশেষ),

'মুতলাক' (مُطْلَق-শর্তহীন)

'মুকাইয়াদ' (مُقَيَّدٌ-শর্তযুক্ত),

'হাকিকি' (حَقِيْقِى-শাব্দিক) এবং

'মাজাযী' (مَجَازِى-রূপক)

এর মতো আরো কতিপয় দ্ব্যর্থহীন ও দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। অন্যদিকে কোরআনের আইন সংক্রান্ত আয়াত ও আইন সম্পর্কিত হাদিসসমূহকে ফুকাহারা (আইনবিদ) কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। যেমন :

ইবারা আল নাস (عِبَارَة النَّص) –সুস্পষ্ট শব্দ এবং বাক্য থেকে আইন প্রণয়ন করা।

www.pathagar.com

ইশারা আল নাস (إِشَارَةُ النَّص) যেখানে নস বা পাঠ্যের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করা হয়।

দালালা আল নাস (دَلَالَةُ النَّص) যেখানে নাসের মূল সুর ও যুক্তির আলোকে আইন প্রণয়ন করা হয়।

ইকতিদা আল নাস (إِقْتِضَاءُ النَّص) যেখানে মূল পাঠের প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন করা হয় কিন্তু মূল পাঠ এ ব্যাপারে নীরব।

'উসূলুল ফিকহ' (أُصُوْلُ الفِقْهِ) ইসলামী আইনের মাধ্যমিক উৎস নিয়েও পর্যালোচনা করে থাকে। যেমন

ইজমা (إِجْمَاعٌ-সম্মতি),

কিয়াস (قِيَاسٌ-সাদৃশ্যতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ),

ইসতিহসান (إِسْتِحْسَان-আইনগত প্রাধান্য) এবং

ইজতিহাদের (إِجْتِهَاد-গবেষণা ও যুক্তির প্রয়োগ)। আইন প্রণয়নের এ সকল মাধ্যমিক উৎস অবশ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরআন ও সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিয়াসের তিনটি মূল উপাদান 'আছল' (মূল ঘটনা), 'হুকুম' (আছলের প্রেক্ষিতে রায়) এবং 'ইল্লাহ' (কার্যকর কারণ) প্রাথমিক উৎসের উপর নির্ভরশীল। 'উসূলুল ফিকহ' ইসলামী আইন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা করে থাকে। যেমন আইনের উপর প্রথার প্রভাব কিংবা আইনের উৎস হিসাবে প্রথার ভূমিকা, ইসলামী আইনের গুরুত্বের দিক থেকে স্তর বিন্যাস হলো ঃ

ফরজ (فَرْض),

ওয়াজিব (وَاجِب)

হারাম (حَرَام) এবং

মাকরূহ (مَكْرُوْه),

মান্দুব (مَنْدُوْب- যা শরীয়াহ-এর মূল্যমান ওয়াজিবের নিম্নে) এবং তাআ'রুদ (বিরোধ নিরসন) ইত্যাদি।

উসূলের কতিপয় পাঠ্যে বিস্তারিতভাবে আরবি ভাষার ব্যাকরণ আলোচিত হয়ে থাকে। নিঃসন্দেহে বলা চলে ইসলামী আইনবিদদের (উসুলিউন) জন্য আরবি ভাষার জ্ঞান ও ব্যাকরণ জানা অত্যাবশ্যকীয় তবে এটা উসূলের বিষয়বস্তু নয়।

উসুল পাঠ থেকেই আমরা জানতে পারি কোরআন ও সুন্নাহসহ সকল মাধ্যমিক উৎসের ব্যাখ্যা পদ্ধতি, বর্তমান ও অতীতকালের ইসলামী বিশেষজ্ঞদের উসুল

www.pathagar.com

বিষয়ে মনোভাব, কিয়াসের মাধ্যমে প্রদত্ত রায়ের বিবরণ, ইজতিহাদের অন্যান্য পদ্ধতি, ইসলামী আইন এবং আইনবিষয়ক তাত্ত্বিক বিষয়াদির বিকাশ সংক্রান্ত ইতিহাস। উসুল পাঠের মাধ্যমে এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত একজন ব্যক্তি ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন থাকবে। এ ব্যক্তি যেমন অতীতের আইনবিদদের রচিত পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকবে তেমনি বর্তমানের নতুন বাস্তবতার আলোকে আইন প্রণয়ন ও ব্যাখ্যার ব্যাপারেও সচেতন হবে। সে তখন অসচেতন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে। উসুলুল্ ফিকহ্ (أُصُوْلُ الْفِقْهِ)-এর মূল লক্ষ্য হলো ইজতিহাদকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইনবিদদের আইনের উৎসসমূহ থেকে আইন প্রণয়নে পথ প্রদর্শন করা।

ইমাম শাফিঈকে أُصُوْلُ الْفِقْهِ বা ফিকহ বিজ্ঞানের জনক বলা যেতে পারে। কথাটা এই অর্থে সত্য যে, উসুলুল ফিক্হর মূলনীতিগুলো ইমাম শাফিঈ প্রথমে প্রণালীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেন। ইমাম শাফিঈর পূর্বের আইনবিদরা নীতির আলোকেই আইন প্রণয়ন করতেন তবে সে সকল নীতি একত্রিত এবং সুবিন্যস্ত ছিল না। ইমাম শাফিঈর পরে প্রচুর বিজ্ঞ ব্যক্তি উসুল পাঠের ব্যাপারে অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবুল হাসান আল বাসরী (মৃত্যু ৪৩৬), ইমাম আল হারামাইন আল যুয়াইনী (মৃত্যু হিঃ ৪৮৭), আবু হামিদ আল গাযযালী (মৃত্যু ৫০৫), ফখরুদ্দিন আল রাযী (মৃত্যু হিঃ ৬০৬), সাইফুদ্দিন আল আমিদি, আবুল হাসান আল কারখি (মৃত্যু হিঃ ৩৪৯), ফখরুদ্দিন আল বাযদাওয়ি (মৃত্যু ৪৮৩), আবু বাকার আল জাসসাস (মৃত্যু ৩৭০), সাদর আল শারিয়াহ (মৃত্যু ৭৪৭), তাজউদ্দিন আল সুবকি (মৃত্যু : ৭৭১) এবং ইমাম আল শাতিবি প্রমুখ।

প্রাথমিকভাবে উসুল পাঠের দুটো ধারা বিকাশ লাভ করে-তাত্ত্বিক ও আরোহী। তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে ইমাম শাফিঈর মাধ্যমে, যিনি সুসংবদ্ধভাবে কতিপয় নীতি প্রণয়ন করেন। অন্যদিকে প্রাথমিক ও পরবর্তী হানাফী পণ্ডিতগণ কোরআন ও সুন্নাহর ভিতরে প্রদত্ত আইনের দিকে বিস্তারিতভাবে মনোনিবেশ করেন এবং সেই আলোকে সেখান থেকে আইন প্রণয়নের সূত্র প্রণয়ন করেন। যাইহোক, পরবর্তী পণ্ডিতগণ দুটো ধারাকে সমন্বিত করেন এবং বর্তমানে এই সমন্বিত ধারা প্রচলিত রয়েছে।

www.pathagar.com

কোরআন (قُرْآنٌ)

উসুলের কতিপয় পুরানো স্বীকৃত গ্রন্থে (যেমন শেখ আহমদ ইবন আবু সাঈদ রচিত *'নূরুল আনোয়ার'* বা শেখ আবুল বারাকাত ইবন আহমদ নাসাফি রচিত 'মানার' গ্রন্থদ্বয়) উসুলের বেশি ভাগ অংশ হচ্ছে 'কিতাবুল্লাহ' অর্থাৎ কোরআন শিরোনামের অধীনে। এ শিরোনামের অধীনে আলোচিত বিষয়সমূহ হলো, কোরআনের শব্দের শ্রেণীবিন্যাস (অথবা আরবি ভাষা), কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় আরবি ব্যাকরণ যেমন,

'হুরূফুল মা-আনি' حُرُوْف الْمَعَانِى (অর্থ সহযোগ শব্দ),

'হুরূফুল আতফ' حُرُوْف الْعَطْف (সংযোজক অব্যয়),

'হুরূফুল জার' حُرُوْف الْجَار (যেসব শব্দ পরবর্তী ইসমকে জের দেয়), 'হুরূফুল আসমাউজ জুরুফ' حُرُوْف أَسْمَاءُ الظروف (সময় ও স্থান বিশেষ্যসমূহ),

'হুরূফুল শর্ত (حُرُوْف الشرط- শর্ত নির্দেশক বর্ণমালা)। উসুল গ্রন্থের কিতাবুল্লাহ অংশে আরো যা আলোচিত হয় তা হলো কোরআন বা হাদিস ব্যাখ্যার পদ্ধতি, যেমন

'ইবরাতুন নাস' عِبَارة النص

'ইশারাতুন নাস্' إشارة النَّصّ ।

আলোচ্য গ্রন্থে কোরআন অধ্যায়ের উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হবে না। বরং কতিপয় আধুনিক উসুল বিশেষজ্ঞের আদলে 'ব্যাখ্যার পদ্ধতি' এই শিরোনামের অধীনে কোরআন ও হাদিসের শব্দ ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিন্যাসের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। এখানে ব্যাকরণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হবে না বরং আগ্রহী পাঠকের প্রতি অনুরোধ রইল তারা যেন আরবি ভাষা ও ব্যাকরণ ভিন্নভাবে পাঠ করে নেয়। আলোচ্য পরিচ্ছেদে কোরআনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও এর ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

কোরআন হলো এমন গ্রন্থ, যা আল্লাহর বাণী হিসাবে রাসূল মোহাম্মদ (সা) এর নিকট নাজিল হয়েছে। কোরআনে মোট ১১৪টি অসম আয়তনের সূরা রয়েছে এবং সূরাগুলির সূচি বিষয়ানুসারে বিন্যস্ত নয়।

ওহী জাহির (وحى ظاهر -প্রকাশ্য ওহী),

ওহী বাতিন (وحى بَاطِن-অপ্রকাশ্য ওহী)

www.pathagar.com

ওহী জাহির (وحى ظاهر -প্রকাশ্য ওহী) কোরআন প্রকাশ্য ওহীর (ওহী জাহির) সমষ্টি আল্লাহর ভাষায় মানুষের সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ।

ওহী বাতিন (وحى بَاطِن-অপ্রকাশ্য ওহী) থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে ওহী বাতিন অনুপ্রেরণা ও ধারণামূলক। রাসূল (সা) এর হাদিস ওহী বাতিন পর্যায়ভুক্ত।

হাদিসে কুদসী, যেখানে আল্লাহকে রাসূল (সা) উদ্ধৃত করেছেন, যা কোরআনের পর্যায়ভুক্ত নয়, প্রকৃতপক্ষে-এ সকল হাদিসের সনদ (হাদিস বর্ণনাকারীদের আনুক্রমিক) যথার্থ কিনা তা যাচাই সাপেক্ষ বিষয়। যদি সনদ (আনুক্রমিক) দুর্বল থাকে তবে হাদিসটি দুর্বল বলে বিবেচিত হবে যদিও হাদিসটি হাদিসে কুদসী পর্যায়ভুক্ত হয়। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাসূল (সা) হাদিসে কুদসী ও অন্যান্য হাদিসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেননি।

কোরআনের শুধু অর্থ (مَعْنَى- মা'না) কিংবা শুধু পাঠ বা Text (نَظْم- নাজম) কোরআন নয়। ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে অর্থ ও পাঠের সমষ্টিই কোরআন।

কোরআন নাজিল হয়েছে ধাপে ধাপে (১৭:১০৬) এবং ধারাবাহিকভাবে (২৫:৩২)। ওহীর ধারাবাহিক অবতরণ (نُزُوْل) ওহীকে হৃদয়ঙ্গম করতে ও মুখস্থ করতে সহায়তা করেছে। সকল ইসলামী বিশেষজ্ঞ সমগ্র কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

কোরআনের বৃহৎ অংশ নাজিল হয়েছে মক্কাতে (প্রায় ১৯/৩০ ভাগ) এবং বাকি অংশ মদীনাতে। মক্কায় নাজিলকৃত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে এক আল্লাহতে বিশ্বাস, অবিশ্বাসীদের সাথে বিরোধ, সত্যের দিকে অবিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান ইত্যাদি বিষয়সমূহ। কিন্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহে উপরোল্লিখিত বিষয়াদির অতিরিক্ত পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি, দেওয়ানী ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি ইত্যাদি বিষয়ক আইনী ধারা আলোচিত হয়েছে। কোনো সূরা যদি প্রথমে মক্কায় নাজিল হয় এবং এর অন্যান্য আয়াতসমূহ পরবর্তীতে যদি মদীনাতেও নাজিল হয়ে থাকে সেই সূরাকে মক্কী সূরা বলা হবে। আর কোন সূরা মক্কী এবং কোনটি মাদানী তা নিরূপণ করা হয়েছে সাহাবী ও তাবেয়ীনদের বর্ণনার প্রেক্ষিতে।

বিভিন্ন হিসাব থেকে দেখা যায়, কোরআনের প্রায় ৫০০টি আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বিবৃত হয়েছে। এ সকল বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ক্ষতিকারক প্রথা, যেমন–শিশু হত্যা, সুদ, জুয়া, সীমাহীন বহুবিবাহ, ক্ষতিপূরণ, মৌলিক ইবাদত ক্ষেত্রে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি প্রসঙ্গে। আরো বর্ণিত হয়েছে দান, শপথ, বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, মহর, ভরণপোষণ, শিশুর প্রতিপালন, দুধপান,

www.pathagar.com

পিতৃত্ব, উত্তরাধিকার এবং হেবা সংক্রান্ত বিষয়াদি। এছাড়াও আছে ব্যবসায়িক আদানপ্রদান যেমন- ক্রয়, বিক্রয়, ধার, বন্ধক; ধনী গরীবের মাঝে সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, সাক্ষ্য, আলোচনা, যুদ্ধ এবং শান্তি ইত্যাদি বিষয়।

যান্নি (ظَنّى-অনুমানগত) এবং কাতঈ (قَطْعى-নিশ্চিত) দুইটি বিষয়ে উসুল পাঠে আলোচনা হয়। কাতঈ এবং যান্নি ধারণাটা আলোচিত হয়েছে পাঠ (text) এবং পাঠের অর্থ বোঝাতে। কোরআনের সমস্ত পাঠই কাতঈ, অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনা সন্দেহাতীত। কোরআনের বাইরে আর যে পাঠকে কাতঈর মর্যাদা দেয়া হয় তা হলো মুতাওয়াতির হাদিস এবং সুন্নাহ। অন্যান্য হাদিস এবং ইজতিহাদ যান্নি পর্যায়ভুক্ত।

কাতঈ : কোরআনের যে সকল পাঠ সুস্পষ্ট শব্দে আলফাজ আল ওয়াজিহা (اَلْاَلْفَاظُ الْوَاضِحَة) বিবৃত হয়েছে এবং শব্দের একটি মাত্র অর্থ বহন করে এ সকল পাঠকে অর্থগত দিক থেকেও কাতঈ বলে বিবেচনা করা হয়।

যান্নী : যা কাতঈর সংজ্ঞার মধ্যে পড়েনা তাই যান্নী। কাতঈ এবং যান্নির গুরুত্ব নির্ভর করে আকীদাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং আহকামগত বিষয়াবলীর স্তরবিন্যাসে ফরজ (فَرْض), ওয়াজিব (وَاجب) সুন্নাহ (سُنَّة), হারাম (حَرَام,) মাকরূহ مَكْرُوْه ইত্যাদি। আকিদা (عَقِيْدَة) বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াবলী নির্ধারিত হয় কাতঈ পাঠ ও কাতঈ অর্থের সমন্বয়ে। একজন ব্যক্তি কাফের বলে বিবেচিত হবে যদি সে কোরআনের কাতঈ পাঠকে অথবা মুতাওয়াতির সুন্নাহকে অস্বীকার করেন, অন্যথায় নয়। একইভাবে ফরজও নির্ধারিত হয় কাতঈ পাঠ ও পাঠের কাতঈ অর্থ সহকারে (দ্রষ্টব্য পরিচ্ছেদ ১৭, ড. হাশিম কামালী, প্রিন্সিপলস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স)।

কোরআনের অধিকাংশ পাঠ অর্থগত দিক থেকে কাতঈ। অর্থগত দিক থেকে যান্নি এ রকম শব্দের উদাহরণ সূরা নিসার (৪:২৩) بَنَاتُكُمْ (বানাতুকুম- তোমাদের কন্যারা) শব্দ এবং সূরা মায়েদার (৫:৩৩) আরবী (ইয়ানফাউ মিনাল আরদ- পৃথিবী থেকে নির্বাসন)।

কাতঈ ও জান্নির আলোচনায় কোরআন ও সুন্নাহ একে অপরের পরিপূরক। যে কোনো একটি যান্নি আয়াত কাতঈ বলে পরিগণিত হতে পারে অন্য যে কোনো একটি কাতঈ আয়াত বা কাতঈ সুন্নাহর মাধ্যমে। একইভাবে যান্নি সুন্নাহ কাতঈ সুন্নাহতে পরিগণিত হতে পারে অন্য কোনো কাতঈ আয়াত বা কাতঈ সুন্নাহর সমর্থনে।

www.pathagar.com

যতদূর সম্ভব কোরআনিক আইনের বৃহদাংশ ব্যাপক আঙ্গিকে (Broader outlines) প্রদান করা হয়েছে, শুধুমাত্র কিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা চলে খুব কম ক্ষেত্রেই কোরআন বিস্তারিতভাবে বিধিনিষেধ বর্ণনা করেছে। সুতরাং এ সংক্রান্ত অপর্যাপ্ততা দূর করতে এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সুন্নাহ এবং ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে।

ভাববার বিষয় হলো, আহকামের কার্যকারণ তালিল (تَعْلِيْل) অর্থ কি তা নিয়ে অনুসন্ধান করার কোনো এখতিয়ার আমাদের আছে কিনা? অধিকাংশ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতে এ বিষয়ে শুধু হ্যাঁ বোধকই নয়, অধিকন্তু ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনের আধুনিকায়নের জন্য অতীব জরুরিও বটে।

যাইহোক, অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ মনে করেন তালিল অনুমোদিত নয়, এবং একই যুক্তিতে কিয়াসও সমর্থনীয় নয়। তবে এই ধারার মতটি দুর্বল এবং সম্ভবত তালিলের উদ্দেশ্য না বোঝার কারণেই এ ধারার সৃষ্টি হয়েছে। অন্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো আসবাব-আল-নাজুল (سَبَبُ النُّزُوْل-আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট)। কোরআনের কোনো আইন আসবাব-আল-নুযূল দ্বারা সীমায়িত নয়। তবে আসবাব-আল-নুযূল কোরআন ও এর আইন বুঝতে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

সুন্নাহ (سُنَّـةٌ)

আরবি ভাষায় সুন্নাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পদচিহ্ন (beaten track) বা আচরণের প্রতিষ্ঠিত ধারা। ইসলামপূর্ব আরবীয়রা সুন্নাহ শব্দ দ্বারা প্রাচীন অথবা প্রচলিত অনুশাসনকে বুঝাতো। হাদিসের ওলামাদের মতে রাসূল (সা) হতে বর্ণিত বক্তব্য, কর্ম এবং নীরব সম্মতি–এই তিনের সমষ্টিই হলো সুন্নাহ। উসুল বা আইন শাস্ত্রে আইনের উৎস হিসাবে সুন্নাহ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণ হলো, রাসূলের বিদায় হজ্ব এবং মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা) কে ইয়ামন পাঠানোর বর্ণনায়।

আইনতত্ত্বে সুন্নাহ শব্দটির সূচনা হয় হিজরি প্রথম শতকের শেষে। উল্লেখ করা দরকার যে দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধে ইমাম শাফিঈ সুন্নাহ শব্দটি রাসূলের সুন্নাহতে সীমায়িত করে দেন। উসূলুল্ ফিকহ্তে সুন্নাহকে শরীয়াহর দ্বিতীয় উৎস হিসাবে বোঝানো হয়, কোরআনের পর যার স্থান। কিন্তু ফিকহর ওলামাদের কাছে সুন্নাহ বলতে প্রাথমিকভাবে শরীয়তের সেই অংশকে বোঝায় যা অবশ্য করণীয় পর্যায়ভুক্ত নয়, তবে তা মান্দুব বা অনুমোদিত পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু শরীয়তের উৎস হিসাবে সুন্নাহ কোনো কিছুকে ওয়াজিব, হারাম বা মাকরুহ বলে ঘোষণা করতে পারে। সাধারণ ব্যবহারে সুন্নাহ এবং হাদিস উভয় শব্দই রাসূল (সা) এর আচরণের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুন্নাহ কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রমাণ (হুজ্জাহ)। কোরআন সাক্ষ্য দেয় যে, সুন্নাহ ঐশী প্রেরণামূলক (৫৩:৩)। কোরআন রাসূল (সা) কে মানতে নির্দেশ করেছে (৪:৫৯, ৪:৮০, ৩৩:৩৬, ৫৯:৭)। রাসূল (সা) কে বিচারক মানতে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

এক ধরনের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সুন্নাহকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

কাউল (قَوْلِى-)-মৌখিক উচ্চারণ,

ফেইলী (فِعْلِى)-বাস্তব কর্ম এবং

তাকরিরি (تَقْرِيْرِى-)-নীরব অনুমোদন।

বিধিগত এবং অবিধিগত সুন্নাহ–এ দুই ভাগেও সুন্নাহকে ভাগ করা যায়।

বিধিগত সুন্নাহ বা সুন্নাহ তাশরীইয়্যা (سُنَّة تَشْرِيْعِيَّةٌ) বলতে একজন শাসক ও বিচারক হিসেবে রাসূল কর্তৃক সকল বক্তব্য ও কর্মের সমষ্টিকে বোঝায়।

অবিধিগত সুন্নাহ বা সুন্নাহ গায়র তাশরীইয়্যা (سُنَّة غَيْرُ تَشْرِيْعِيَّةٌ) হলো রাসূল (সা) এর খাদ্যাভ্যাস, নিদ্রাযাপন, পরিধেয় পোষাক পরিচ্ছদ এবং এইরূপ অন্যান্য আচরণ যা শরীয়তের অংশ নয়। 'নূরুল আনোয়ার' নামক উসুল গ্রন্থে রাসূলের এসব কার্যকলাপকে অভ্যাস (عَادَة-আদত) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু কিছু

www.pathagar.com

আচরণ অবশ্য দুটো অংশেই পড়ে। একজন যোগ্য বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এই বিভাজন করা সম্ভব। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি পেশাগত বিষয়ে বর্ণিত সুন্নাহ শরীয়াহর অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূল (সা) এর সেই সকল কথা ও কাজ যা বিশেষ অবস্থার সাথে সম্পর্কিত, যেমন যুদ্ধকৌশল, শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল, আক্রমণের সময়সূচি, অবরোধ অথবা অবরোধ তুলে নেয়া–এই সকল সাময়িক অবস্থাধীন বিষয়াবলী শরীয়াহভুক্ত নয়।

আরো কিছু বিষয় আছে যা শুধু রাসূল (সা) এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা, মোহর ব্যতীত বিয়ে, রাসূল (সা) এর স্ত্রীদের পুনর্বিবাহে নিষেধাজ্ঞা। কোরআন ও সুন্নাহর প্রকৃতিগত ভিন্নতা, সুন্নাহর যথার্থতা এবং সুন্নাহ যেহেতু কোরআনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা তাই সুন্নাহর উপর অবশ্যই কোরআনের প্রাধান্য থাকবে। যদি কখনো উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তবে অবশ্যই কোরআন প্রাধান্য পাবে। কখনোই সুন্নাহ্‌র অনুকূলে কোরআন বাতিল হবে না।

উল্লেখ করা দরকার যে, সুন্নাহ্‌ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোরআনকে সমর্থন করে। সুন্নাহ কোরআনের সালাত, যাকাত, হজ, সুদ, লেনদেন এরূপ আরো অনেক বিষয়ে অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং স্পষ্টতর করে তোলে। সুন্নাহর আরেকটি অংশ হলো ভিত্তিমূলক সুন্নাহ (السُّنَّةُ الْمُؤَسِّسَة -সুন্নাহ আল মুআস্‌সাসা) অর্থাৎ যে বিধান সুন্নাহতেই কেবল রয়েছে, যেমন ঃ স্ত্রীর খালা ও ফুফুকে একত্রে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা অথবা সম্পত্তির প্রাক ক্রয়ের অধিকার (শুফা) ইত্যাদির উল্লেখ কোরআনে পাওয়া যায় না। সুন্নাহ আল মুআস্‌সাসাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা ও অধিকারের দৃষ্টান্ত কোরআনে উল্লেখ ব্যতীত সুন্নাহর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে।

সূরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতের মর্মার্থ শরীয়াহর স্বাধীন উৎস হিসাবে সুন্নাহকে অস্বীকার করা নয়। অন্যান্য বই থেকে উল্লেখ করা যায় যে (যা ডঃ হাশিম কামালীর গ্রন্থে আলোচিত হয়নি) শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরা সংগৃহীত হাদিসকে গ্রন্থে স্থান দেবার পূর্বে সংগ্রহের সময়ই সকল হাদিসকে নিরীক্ষণ করে দেখেছেন হাদিসসমূহের ইসনাদ (বর্ণনাসূত্র) যথার্থ কিনা? এবং এই নিরীক্ষার ভিত্তিতে হাদিসসমূহকে

সহীহ (صَحِيْح),
হাসান (حسن) ও
জইফ (ضَعِيْف) বা দুর্বল এবং
মাওজু (বানোয়াট) এই চার ভাগে ভাগ করেছেন।

এখনো হাদিস শাস্ত্রের পুনঃ নিরীক্ষা চলমান। বর্তমান শতকে *নাসিরুদ্দিন আলবানী* এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যারা আরবিতে পারদর্শী তারা

www.pathagar.com

আলবানীর লিখিত গ্রন্থসমূহ দেখতে পারেন। এর বাইরেও *এম এম আজমী* রচিত *স্টাডিজ ইন হাদিস ম্যাথডোলজি* দেখতে পারেন।

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر) হাদিস প্রায় ক্ষেত্রেই ধারণাগতভাবে কাতঈ হিসাবে বিবেচিত হয় (مُتَوَاتِر بِالْمَعْنَى-মুতাওয়াতির বিল মা'না)।

কিছু হাদিস আছে যা অক্ষরে অক্ষরে মুতাওয়াতির হিসাবে বিবেচিত (مُتَوَاتِر بِاللَّفْظ-মুতাওয়াতির বিল লাফজ)।

আরো উল্লেখ করা দরকার যে মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر) হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক হয়ে থাকে এবং অনেক সময় তারা বিভিন্ন লোকালয়ের অধিবাসী, তাই মিথ্যা উদ্ভাবনের সম্ভাবনাও কম। মুতাওয়াতির হাদিসের শর্তসমূহ হলো:

১. অসংখ্য বর্ণনাকারী থাকবে;
২. বর্ণনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে হবে;
৩. বর্ণনা ভাষাগত দিক দিয়ে বা ইসলামের মৌলিকত্বের দিক দিয়ে যথাযথ হবে;
৪. বর্ণনা সমকালীন গোত্রীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হবে।

উসুলের অধিকাংশ ওলামাদের মতে মুতাওয়াতির হাদিসের কর্তৃত্ব কোরআনের সমতুল্য। মুতাওয়াতির হাদিস স্পষ্ট (কাতঈ) নয়, বরং এই হাদিসের অস্বীকৃতি কোরআন অস্বীকৃতির সমতুল্য।

মাশহুর হাদিস বলতে বোঝায়, যে হাদিসের বর্ণনাকারী তিনজন বা ততোধিক তবে অসংখ্য না, কিন্তু পরবর্তীতে হাদিসটি বহুল আলোচিত হয়েছে। অধিকাংশ ওলামাদের মতে মাশহুর হাদিস এক ধরনের আহাদ (اَحَاد) হাদিস এবং এ প্রকার হাদিস স্পষ্ট (কাতঈ) নয় বরং অনুমানমূলক (যাহা অকাট্য জ্ঞান প্রদান করে না)।

আহাদ হাদিস অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন সাহাবা কর্তৃক এসব হাদিস বর্ণিত হয়েছে এবং দুই তিন প্রজন্মের আগে হাদিসগুলো পরিচিতি পায়নি যা কোনো স্পষ্ট জ্ঞান দেয় না। অধিকাংশ আইনবিদের মতে যদি আহাদ হাদিস একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয় তবে হাদিসটি আইনের ভিত্তি হতে পারে। কিছু আইন বিশারদ আহাদ হাদিসের উপর ভিত্তি করে শরীয়াহ বিধান দানের ক্ষেত্রে মতামত দিয়েছেন, তবে আকীদা (ঈমান) এবং হদ (حَدّ-ইসলামের দণ্ডবিধি) সংক্রান্ত শরীয়াহ আহাদ হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। *ইমাম মালিক* এমন কোনো আহাদ হাদিসের উপর আস্থা স্থাপন করেননি যা মদীনার প্রতিষ্ঠিত প্রথার বিপরীত। অধিকাংশ ইমামের মতে নীতিগতভাবে আহাদ হাদিসের কর্তৃত্ব তখনই থাকবে যদি তা একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হয়। অধিকাংশ ওলামা মনে করেন না যে, আহাদ হাদিস হুবহু একজন থেকে

www.pathagar.com

অন্যজনের নিকট বর্ণিত হতে হবে। আহাদ হাদিসের আংশিকও বর্ণিত হতে পারে যদি বর্ণিত অংশ সামগ্রিক হাদিসটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

যদি কোনো হাদিস বেশ কিছু বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হয়, কারো বর্ণনাতে যদি অন্যদের চেয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা সংযোজিত থাকে তখন আলোচনা করতে হবে যে হাদিসটি একই বৈঠকে উচ্চারিত হয়েছিল কি না? যদি তাই হয় তবে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যেটা এসেছে সেটাকেই গ্রহণ করতে হবে।

মুত্তাসিল (مُتَّصِل- নিরবচ্ছিন্ন) এবং

গাইর আল মুত্তাসিল (غَيْر مُتَّصِل বিচ্ছিন্ন হাদিস) :

মুত্তাসিল (مُتَّصِل- নিরবচ্ছিন্ন) : মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِر), মাশহুর (مَشْهُوْر) এবং আহাদ (أَحَاد) হাদিস যদি অবিচ্ছিন্নভাবে রাসূল (সা) থেকে বর্ণিত হয় তাহলে তা مُتَّصِل মুত্তাসিল পর্যায়ভুক্ত।

গাইর আল মুত্তাসিল (غَيْر مُتَّصِل বিচ্ছিন্ন) হাদিস : মুরসাল(مُرْسَل), মুদাল (مُعْضَل) এবং মুনকাতঈ (مُنْقَطِع) গাইর আল মুত্তাসিল পর্যায়ভুক্ত হাদিস।

মুরসাল হাদিস : অধিকাংশ ওলামাদের মতে যে হাদিস সাহাবার নামোল্লেখ ব্যতীত একজন তাবেয়ীনের মুখ হতে বর্ণিত হয়েছে তাই হলো মুরসাল হাদিস। অধিকাংশ ওলামা মুরসাল হাদিসকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করেননি। ইমাম আহমদ এবং ইমাম শাফিঈ মুরসাল হাদিসের উপর আস্থা স্থাপন করেননি যদি না হাদিসটি একজন বিখ্যাত তাবেয়ী কর্তৃক বর্ণিত না হয় এবং এ ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য হবে যদি কিনা কতিপয় শর্ত পালিত হয় (এসব শর্তের উল্লেখ উসূলের বইসমূহে আছে)। অন্যদিকে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালিক অন্য দুই ইমামের চেয়ে মুরসাল হাদিস গ্রহণের ক্ষেত্রে কম কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

মুনকাতি (مُنْقَطِع) হাদিস : যে সকল হাদিসের সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম অনুপস্থিত রয়েছে তাকে মুনকাতি (مُنْقَطِع) হাদিস বলে।

মু'দাল (مُعْضَل) হাদিস : মু'দাল (مُعْضَل) হাদিস হলো তাই, যে হাদিসের সনদে পরপর দুজন বর্ণনাকারীর নাম অনুপস্থিত।

সহীহ (صَحِيْح), হাসান (حَسَن)এবং জঈফ (ضَعِيْف):

হাদিসসমূহকে আবার সহীহ (صَحِيْح), হাসান (حَسَن) এবং জইফ (ضَعِيْف) এই তিন ভাগেও ভাগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সহীহ (صَحِيْح) হাদিস : কোনো হাদিসকে সহীহ বলা যাবে (সহীহ এই অর্থে যে, হাদিসটির বর্ণনাকারী অত্যন্ত বিশ্বস্ত; এই অর্থে নয় যে হাদিসটি সর্বাত্মকভাবে সঠিক বা কাতঈ) যদি হাদিসটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত (ثِقَةٌ ثَابِتٌ -সিকাতুন সাবিতুন) অথবা বিশ্বস্ত (ثَابِتٌ -সাবিতুন) বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হয়।

হাসান (حَسَن) হাদিস : একটি হাদিস হাসান বলে গৃহীত হবে যদি বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ সাদিক (সত্যবাদী), সাদিক ইয়াছিম (সত্যবাদী সত্ত্বেও ভুল করে) এবং মাকবুল (এমন ব্যক্তি যে অবিশ্বস্ত নয়)।

জইফ (ضَعِيْف) হাদিস : একটি হাদিস জইফ (ضَعِيْف) বলে গৃহীত হবে যদি বর্ণনাকারীদের মধ্যে কেউ মাজহুল (مَجْهُوْل -অপরিচিত) অথবা ফাসিক (তাকওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীন) ব্যক্তি থাকে।

www.pathagar.com

কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা

উসূলুল ফিক্‌হ্‌-এর (أُصُوْلُ الْفِقْه) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক উৎস কোরআন ও সুন্নাহকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। কোরআন এবং সুন্নাহর পাঠ এবং পাঠের অর্থ বোঝার জন্যই এ ব্যাখ্যা কৌশল জানা দরকার। কোনো ব্যক্তি যদি কোরআন ও সুন্নাহকে গভীরতর ভাবে ব্যাখ্যা করতে চায় তবে তার আরবি ভাষার জ্ঞান প্রয়োজন। এই জন্য উসূলুল্ ফিকহর লেখকগণ উসূলুল্ ফিকহর পাঠ্যসূচিতে শব্দের শ্রেণী বিভাগ সংযোজিত করেছেন।

পাঠ (Text) স্বয়ং যদি প্রমাণ (হুজ্জাহ) হয়ে থাকে তবে সাধারণত ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয় না। যাইহোক, ফিক্‌হ অথবা আইনের বৃহদাংশ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই রচনা করা হয়েছে, কেননা আইন সংক্রান্ত মৌলিক পাঠ স্ব প্রামাণ্য নয়। এটা উল্লেখ করা দরকার যে তাবিল (تَأْوِيْل-ব্যাখ্যা) এবং তাফসির (تَفْسِيْر) এক বিষয় নয়।

তাফসির (تَفْسِيْر) : তাফসিরের লক্ষ্য হলো প্রদত্ত পাঠের অর্থ ব্যাখ্যা করা এবং উক্ত পাঠের পরিসীমা থেকে আইনের ধারা বের করে অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করা।

তাবিল (تَأْوِيْل-ব্যাখ্যা) : তাবিল পাঠের শাব্দিক অর্থের বাইরে যেয়ে এর লুক্কায়িত অর্থ বের করার চেষ্টা করা। যা প্রায়ই অনুমানকৃত যুক্তি এবং ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল।

যদি না অন্য কোনো বিপরীত অর্থ দাঁড়ায় তবে পাঠ্যের প্রত্যেকটি শব্দের প্রকৃত (مُطْلَق-মুতলাক), সাধারণ (عَام-আম) এবং শাব্দিক অর্থ বের করার চেষ্টা করা হয়।

তাফসির তাশরীঈ : কোরআন বা সুন্নাহর একাংশের ব্যাখ্যা (تَأْوِيْل-তাবিল) কোরআন বা সুন্নাহর অন্য অংশ দ্বারা প্রদান করা হয় তবে একে তাফসির তাশরীঈ বলে এবং এই ব্যাখ্যাকৃত অংশকে অপরিবর্তনীয় আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তবে যদি তাফসির (تَفْسِيْر) অথবা তাবিল تأويل– মতামত বা ইজতিহাদের (إجتهاد) রূপ নেয় তবে এ ব্যাখ্যাসমূহকে অখণ্ড আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। আইনের এই অংশের মর্যাদা নিয়ে মতবিরোধ আছে। তাবিলে প্রাসঙ্গিকতা আছে, সকলেই এই রূপ তাবিলকে আইন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে তাফসিরের বিভিন্ন ধরন হতে পারে। তাই অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক তাফসির আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। যাহিরী বিশেষজ্ঞরা তাফসিরকে গ্রহণ করে না, তবে এ অবস্থান বাস্তবসম্মত নয় এবং দুর্বলও বটে।

www.pathagar.com

স্পষ্ট শব্দ:

দ্ব্যর্থহীন শব্দসমূহকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণী চারটি হলো

জাহির (ظَاهِر),

নাস (نَصٌّ),

মুফাস্সার (مُفَسَّر) এবং

মুহ্কাম (مُحْكَم)।

জাহির (ظَاهِر) : জাহির হলো সেই ধরনের শব্দ যার অর্থ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন, তথাপিও তাবিলের (تَأْوِيل) জন্য উন্মুক্ত কেননা, এই সকল শব্দের অর্থ প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

নাস (نَصٌّ) : নাস্ (نَصٌّ) হলো দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট শব্দ এবং প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল—এটিও তাবিলের জন্য উন্মুক্ত।

জাহির (ظَاهِر)আর নাস্ (نَصٌّ) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে উল্লিখিত শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যশীল কিনা কিংবা শব্দটির অর্থ মূখ্য না গৌণ তার উপর। জাহির আর নাস্ শব্দসমূহের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে যদি না তাবিলের কোনো ন্যায্য কারণ থাকে। ফিক্হ্শাস্ত্রে 'নাস্' শব্দটির পূর্ব আলোচিত অর্থের বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ কোরআন এবং সুন্নাহর নির্দিষ্ট পাঠ (text)। এখানে অবশ্য এ অর্থে নাস্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি।

মুফাসসার (مُفَسَّر) এবং মুহকাম (مُحْكَم) ঃ মুফাসসার (مُفَسَّر-দ্ব্যর্থহীন) এবং মুহকাম (مُحْكَم-প্রাঞ্জল) শব্দ বলতে সেই সব শব্দসমূহকে বোঝায় যা সার্বিকভাবে স্পষ্ট এবং এই ক্ষেত্রে তাবিলের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না (জাহির আর নাস শব্দসমূহের সাথে মুফাসসার আর মুহকাম শব্দদ্বয়ের পার্থক্য এখানেই) স্পষ্টতার দিক থেকে মুফাসসার এবং মুহকাম শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে আইনবিদেরা শব্দদ্বয়ের মধ্যে ভিন্নতা আরোপ করেছে নাসখ (نسخ) এর প্রেক্ষিতে। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-Abrogation বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা সংযোজন-বিয়োজন। আইনবিদদের মতে মুহকাম নাখ্স যোগ্য নয়, আর মুফাসসার নাসখ যোগ্য। তবে এ পার্থক্যের খুব একটা প্রায়োগিকতা নেই। কেননা এখন নতুন করে আর নাসখের অবকাশ নেই।

অস্পষ্ট শব্দ

অস্পষ্ট শব্দ (الأَلْفَاظُ غَيْرُ الوَاضِحَة-আল আলফাজ গাইর ওয়াদিহাহ) চার শ্রেণীভুক্ত। যথা :

www.pathagar.com

খাফি (خَفِيٌّ-দুর্বোধ্য),

মুশকিল مُشْكِل-আয়াসসাধ্য),

মুজমাল(সংক্ষিপ্ত অর্থবোধক) বা (مُجْمَل বিপরীতধর্মী) এবং

মুতাশাবিহ (مُتَشَابِه-জটিল ও প্রচ্ছন্ন)।

খাফি (خفى) : শাফিঈর উদাহরণ হলো সারিকা (سَرِقَة-চুরি) শব্দটি আংশিকভাবে স্পষ্ট নয় বা দুর্বোধ্য, কেননা 'পকেটমার' চুরির পর্যায়ভুক্ত কিনা তা বোধগম্য নয়, কিন্তু এটা জানা অত্যন্ত জরুরি। যদি কিনা 'পকেটমার' চুরির অন্তর্ভুক্ত না হয় (এটাই অধিকাংশ আইনবিদদের মত) তবে 'পকেটমার' হদের (কোরআন এবং সুন্নাহ বর্ণিত আইন) সম্মুখীন না হয়ে তাজীরের (আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা প্রণীত আইন) সম্মুখীন হবে।

মুশকিল (مُشْكِل) : মুশকিল (مُشْكِل) শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। তাই পাঠ্যের প্রকৃত অর্থ নিরূপণের জন্য ইজতিহাদ (إِجْتِهَاد) ও তাবিলের (تَأْوِيْل) শরণাপন্ন হতে হয় (এক্ষেত্রে একাধিক মতামত থাকতে পারে)। মুশকিল সহজাতভাবে দ্ব্যর্থক শব্দ। কিন্তু খাফি (خفى) শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ আছে একটা পাঠ মুশকিল বলে বিবেচিত হতে পারে যদি তার বিভিন্ন অর্থ হয়।

মুজমাল (مُجْمَل) : মুজমাল (مُجْمَل) সেই সকল শব্দ ও পাঠকে নির্দেশ করে যা সহজাতভাবে অস্বচ্ছ এবং কোনটি সঠিক অর্থ সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনাও দেয় না। মুজমাল শব্দের নানাবিধ অর্থ থাকতে পারে অথবা এটি একটি অপরিচিত শব্দ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সালাত, হজ্ব, রিবা এবং সিয়াম শব্দসমূহের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শব্দসমূহ তাদের শাব্দিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে শব্দগুলি টেকনিক্যাল বা শরঈ অর্থ গ্রহণ করেছে। যাইহোক, এই শব্দসমূহ পুরোপুরি পরিষ্কার (مُفَسَّر -মুফাস্সার) রূপ পরিগ্রহ করেছে, যেহেতু এ ব্যাপারে সুন্নাহতে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। একশত এক নং সূরার এক হতে পাঁচ নং আয়াতে উল্লিখিত 'আল কারিয়াহ' শব্দটি মুজমাল শব্দের উদাহরণ। শব্দটি কোরআন কর্তৃক ব্যাখ্যাত, ফলে তা স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদি শব্দটির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা আল্লাহ কর্তৃক প্রদান করা না হতো তবে মুজমাল শব্দটি মুশকিল বলে বিবেচিত হতো এবং ইজতিহাদ ও তাবিলের জন্য শব্দটি উন্মুক্ত থাকত।

মুতাশাবিহ (مُتَشَابِه-জটিল ও প্রচ্ছন্ন) : মুতাশাবিহ (مُتَشَابِه-জটিল) হলো এমন শব্দ যার অর্থ রহস্যময়। হরফুল মুকাত্তাআত (الْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ) যথা আলিফ লাম মিম) হলো মুতাশাবিহাত শব্দসমূহের উদাহরণ। কেউই এসব শব্দের অর্থ জানে না। অনেক বিশেষজ্ঞ কোরআনের যে সকল আয়াতে মানুষের সাথে আল্লাহর সাদৃশ্য আনা হয়েছে সেই সকল আয়াতকে মুতাশাবিহ (مُتَشَابِه) পর্যায়ভুক্ত বলে

www.pathagar.com

বিবেচনা করেছেন। আবার কিছু বিশেষজ্ঞের মতে হরফুল মুকাত্তায়াতগত ব্যতীত আর কোনো শব্দ মুতাশাবিহ পর্যায়ভুক্ত নয়। আইন রচিত হয় এমন পাঠে মুতাশাবিহ শব্দ নেই।

আম (عَام-সাধারণ) এবং খাস (خَاص-নির্দিষ্ট) :

ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দসমূহকে আম এবং খাস দুই ভাগে বিন্যাস করা যায়।

আম (عَام-সাধারণ) : আম হচ্ছে সে সকল শব্দ যার একটি মাত্র অর্থ থাকে এবং যা অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। পরিমাণ সংখ্যা দ্বারা এ ব্যবহার সীমায়িত নয় এবং যে সকল বিষয়ে শব্দটি প্রযোজ্য তার সকলকেই শব্দটি ধারণ করে। আম পর্যায়ভুক্ত শব্দের উদাহরণ হলো 'ইনসান' (اَلْاِنْسَانُ) বাংলায় মানুষ। যখন আরবিতে আল (اَل) আর্টিকেলটি কোনো বিশেষ্য পদের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন বিশেষ্য পদটি আম বলে বিবেচিত হয়। আরবি ভাষায় জামি (جَمِيْع -সকল), ক্বাফ্ফা (সকল), কুল্লু (كُلُّ -সকল) শব্দত্রয় যদি অন্য কোনো শব্দসমূহের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয় তখন তা আম বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদিসের উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন لاَضرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسْلاَمِ (লা দ্বারার ওয়ালা দিরারা ফিল ইসলাম) অর্থ- ইসলামে কষ্ট দেয়া এবং কষ্ট গ্রহণ করায় কল্যাণ নেই। যখন কোনো আদেশ আম শব্দের ব্যবহার যোগে করা হয় তখন আদেশটি প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রেই আরোপিত হবে। আমের ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য শুধু ভাষার ব্যাকরণের দিকে খেয়াল রাখলেই চলবে না বরং বাস্তবিক ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এবং যদি কখনো ব্যাকরণ রীতি ও ব্যবহারিক রীতির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে ব্যবহারিক রীতিই প্রাধান্য পাবে। 'আম' শব্দ তিন ধরনের হতে পারে। যথা:

১. সার্বিকভাবে সাধারণ [مَامِنْ دَابَّةٍ] 'মা মিন দাব্বাতিন (হুদ : ৬)

২. আম হিসাবে যার প্রয়োগ ঘটবে। (আল ইমরান : ৯৭)

৩. আম হিসাবে সর্বত্র যাকে বিশেষায়িত করা হয়। (বাকারা : ২২৮ এবং আহযাব : ৪৯)

আরবিতে 'তিনি' শব্দটি খাস, তবে শর্তারোপিত বাক্যে শব্দটি ব্যবহৃত হলে শব্দটি আম হয়ে যায় ২:১৮৫, ৪:৯২)।

খাস (خَاص-নির্দিষ্ট) : খাস এমন শব্দ যা সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তবে ব্যবহৃত ক্ষেত্রের সকল কিছুকেই অর্ন্তভুক্ত করে। যেমন- এক দুই, একশত, দিনার, ইমরান, একটি ঘোড়া, একজন মানুষ এ সকল শব্দ খাস শব্দের উদাহরণ। আইনগত যে বিধান বা নির্দেশ সুনির্দিষ্ট ধারায় বর্ণিত হয়েছে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট এবং তাবিলের জন্য উন্মুক্ত নয়। এ ব্যাপারে সাধারণ সম্মতি হচ্ছে খাস হলো কাত্ঈ অর্থাৎ এর অর্থ এবং প্রয়োগ যে কোনো সন্দেহের উর্ধে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরআন ও হাদিসের ব্যবহৃত ৯৯ ভাগ শব্দই আম (عَام) ।

ওলামাগণ আম শব্দটি যান্নি না কাতঈ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে আম হলো যান্নি, তবে অল্পসংখ্যকের মতে আম হলো কাতঈ। এ মতবিরোধের ফলাফল পরিষ্কার হয়ে যায় আম ও খাসের বিরোধের ক্ষেত্রে। একই বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাতে দুটি ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেলে এবং বর্ণনা দুটির একটি আম ও অন্যটি খাস হলে অধিকাংশ ওলামার মতে আমটি খাস দ্বারা ব্যাখ্যাত হবে। অন্য অংশের মতে খাস দ্বারা বিশেষায়িত হবে।

সকলের মতে খাস হলো কাতঈ(قَطْعِي), আম কাতঈ নয়। এর ফলে খাস আমের উপর প্রাধান্য পাবে। সংখ্যালঘু অংশের মতে আমও কাতঈ এবং তাই দুটি মত যদি সময়ের ক্রমানুসারে সমান্তরাল হয় তবে আম খাস দ্বারা বিশেষায়িত হবে। খাস রদ হয়ে যাবে যদি আমের উৎপত্তি পরে হয়। আম আংশিকভাবে বিশেষায়িত হবে যদি খাসের উৎপত্তি পরে হয়। অধিকাংশের মতানুসারে একটি আম প্রস্তাবনা একটি নির্ভরযোগ্য বা কাতঈ বাক্যাংশ দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে, এবং এই বাক্যাংশটি একই পাঠের বা আয়াতের কিংবা অন্য কোনো পর্যায়ভুক্তও হতে পারে। আর এসব কিছু সম্ভব ইসতিসনা (إِسْتِثْنَاء -ব্যতিক্রম, উদাহরণ ২:২৮২) কায়দ (শর্ত, উদাহরণ ৪:১২), সিফাত (صِفَة -গুণ, উদাহরণ ৪:২৩), গায়াহ (প্রয়োগেরসীমা, উদাহরণ ৫:৬) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।'

আমের ফলাফল হলো এটা সাধারণই থাকবে, যদি না আমকে বিশেষায়িত করা হয়। এমনকি আংশিক বিশেষায়িত করার পরও অবিশেষায়িত অংশের জন্য আমই আইনগত কর্তৃপক্ষ। আমের পূর্বে বা পরে তাখসিস (সীমাবদ্ধতা) থাকুক বা না থাকুক অধিকাংশের মতে সার্বিকভাবে আম অনুমানযোগ্য (যান্নি) এবং আম তাবিলের জন্য উন্মুক্ত। একটা কারণ সব আমের প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। উদারহণস্বরূপ, আসবাব আন নুযুল (اَسْبَابُ النُّزُوْل) কোরআনের আয়াত নাজিল হবার প্রেক্ষাপট) কোনো আইনকে শুধু মাত্র যে প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে না।

মুতলাক مُطْلَق এবং মুকায়্যাদ مُقَيَّد:

মুতলাক مُطْلَق : মুতলাক এমন শব্দ নির্দেশ করে যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমায়িত নয়। যখন আমরা বলি 'একটি বই' এ কথাটি কোনো রকম সীমাবদ্ধতা ছাড়া যে কোনো বইয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। মুতলাক হলো অসীমায়িত শব্দ।

মুকায়্যাদ مُقَيَّد : যখন মুতলাক শব্দ অন্য শব্দ বা শব্দসম্ভার দ্বারা সীমিত (qualified) হয় তখন শব্দটি মুকায়্যাদ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'একটি লাল বই'। আম ও খাস যেখানে শব্দের পরিধি নিয়ে পর্যালোচনা করে

www.pathagar.com

মুতলাক ও মুকায়্যাদ সেখানে শব্দের প্রয়োগের সীমা নিয়ে আলোচনা করে (যদিও মুতলাকের সাথে আমের ও মুকায়্যাদের সাথে খাসের সাদৃশ্য আছে)। মুতলাকের একটি উদাহরণ হলো 'দাস মুক্ত করে দাও' (৫:৯২)। মুকায়্যাদের উদাহরণ হলো মুমিন '(বিশ্বাসী) দাস মুক্ত করে দাও' (৪:৯২)।

প্রয়োগের দিক থেকে মুতলাক সার্বিক যদি না সীমায়িত হয়ে থাকে। যখন মুতলাক মুকায়্যাদ হিসাবে সীমায়িত হবে তখন পরবর্তী ভাষ্য প্রাধান্য পাবে (৫:৩ এবং ৬:১৪৫)। একই বিষয়ে যদি দুটি ভাষ্য থাকে একটি মুতলাক অন্যটি মুকায়্যাদ এবং এর প্রেক্ষিতে রায় ও কার্যকরণের ভিন্নতা দেখা দেয় তবে দুটি ভাষ্যই কার্যকর হবে এবং কোনোটি সীমায়িত হবে না। এটাই অধিকাংশের মত। ইমাম শাফিঈ অবশ্য কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মত হলো দুটো ভাষ্যের যদি ভিন্ন রায় থাকে কিন্তু কারণ অভিন্ন হয়, সে ক্ষেত্রে মুতলাক (مُطْلَق) মুকায়্যাদ দ্বারা সীমায়িত হবে। প্রাথমিক হানাফী আলেমদের মতে কারণগত দিক থেকে যদি মুতলাক ও মুকায়্যাদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয় তবে একে অপরকে সীমায়িত করতে পারে না।

হাকিকি (حَقِيْقِي-শাব্দিক) এবং মাজাজি (مَجَازِى -রূপক):

সাধারণভাবে শব্দসমূহ শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শাব্দিক অর্থ রূপক অর্থের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে বিশেষ করে আইনগত ক্ষেত্রে। কোরআনের অধিকাংশ অংশই শাব্দিক তবে রূপক অংশও কোরআনে আছে। উদাহরণস্বরূপ কোরআনের ৪০:১৩ নং আয়াতের উল্লেখ করা যায়। এখানে বলা আছে, 'আল্লাহ্ জীবিকা আকাশ থেকে নাজিল করেন, যার অর্থ হবে 'বৃষ্টি'। যদি কোনো ক্ষেত্রে রূপক অর্থ প্রাধান্য পায় তবে সে ক্ষেত্রে রূপক অর্থ শাব্দিক অর্থের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'তালাকের' (طَلَاق) শাব্দিক অর্থ (বিধিনিষেধ থেকে মুক্তি) রদ হয়ে রূপক অর্থ গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে কোরআন ও সুন্নাহর ব্যবহৃত ৯৯ ভাগ শব্দ হাকিকি।

ভাষাগত, ব্যবহারগত এবং আইনগত এই তিন অর্থে হাকিকির বিভিন্ন উপভাগ আছে। হাকিকি এবং মাজাজি

সরিহ صَرِيْح এবং

কিনায়া(كِنَايَة পরোক্ষ) এ দুটো উপভাগে বিভক্ত।

সরিহ (صَرِيْح সরাসরি) : সরিহ (صَرِيْح)সরাসরি হলো এমন শব্দ যার অর্থ জটিলতাহীন এবং সরাসরি। এ সকল শব্দের অর্থ বক্তার নিকট কিংবা লেখকের নিকট জানতে চাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিনায়া(كِنَايَة (পরোক্ষ) : কিনায়া (পরোক্ষ) হলো এমন বক্তব্য যা বক্তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে না, এ ক্ষেত্রে শ্রোতাকে বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য জানবার জন্য পুনরায়

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ স্বামী স্ত্রীকে বলল ই'তাদ্দি (গণনা শুরু কর)। এর দ্বারা তালাক বুঝায় না, কেননা ভাব পরিষ্কার নয়। এ ক্ষেত্রে বক্তাকে তার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করা হবে।

মুশতারাক (مُشْتَرَك) :

মুশতারাক শব্দ হলো এমন শব্দ যার একাধিক অর্থ আছে। 'আইন' (عَيْن) শব্দটি মুশতারাক শব্দ। আরবি ভাষায় এ শব্দটি দ্বারা চোখ, ঝর্ণা, গুপ্তচর ইত্যাদি বোঝায়। এরূপ একাধিক অর্থ হবার কারণ হতে পারে বিভিন্ন সময়ে এসব অর্থে কিংবা রূপক অর্থে মুশতারাক শব্দের ব্যবহার। আইনদাতার উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, শরীয়াহর আদেশ কিংবা নিষেধ এমনভাবে বর্ণিত হবে যার অর্থ একাধিক হবে। মুশতারাক শব্দ প্রকৃতিগত দিক থেকে মুশকিল প্রকৃতির এবং শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই সঠিক অর্থ নিরূপণ করা সম্ভব। মুজতাহিদরা (বিশেষজ্ঞরা) এর অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন।

আল দালালাহ:

পাঠ (Text) অর্থ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রধানত দু'টি ধারা প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে হানাফী মত, অন্যটি হচ্ছে শাফিঈ মত। এই দু' ধারা মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। হানাফী ধারার উসুলিয়ানদের মতে পাঠ বা Text বিশ্লেষন করে চারটি পদ্ধতিতে আইন বের করা হয়। যথা ঃ

ইবারাতুন-নাস (عِبَارَةُ النَّص) : প্রথম পর্যায়ভুক্ত শব্দ হলো ইবারাতুন-নাস (عِبَارَةُ النَّص-বাহ্যিক অর্থ)। ইবারাতুন-নাস (عِبَارَةُ النَّص) হলো এমন শব্দ যার অর্থ অবশ্যম্ভাবীরূপে পাঠ থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং শব্দটি পাঠের মূল বিষয়বস্তুরই প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন জুয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান। শরীয়তের অধিকাংশ বিধান ইবারাতুন-নাস পর্যায়ভুক্ত পাঠ থেকে গৃহীত হয়েছে। ইবারাতুন নাস থেকে গৃহীত বিধানের হুকুম কাতঈ পর্যায়ভুক্ত এবং এ সকল বিধানের জন্য কোনো সমর্থনকারী সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না।

ইশারাতুন-নাস (إِشَارَةُ النَّص) : দ্বিতীয় পর্যাভুক্ত শব্দসমূহ হলো ইশারাতুন-নাস (إِشَارَةُ النَّص) এ শব্দসমূহের ইঙ্গিতপূর্ণ কিংবা পরোক্ষ অর্থ থাকে। এ পর্যায়ভুক্ত আয়াত হলো ২:২৩৬, যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, বিবাহের পূর্বেই মোহরানা নির্ধারণ ব্যতিরেকে বিবাহের চুক্তি করা যাবে কিনা? তবে গভীর অনুসন্ধান ধারণা দেয় মোহরানা নির্ধারণ ব্যতিরেকে বিবাহের চুক্তি সম্ভব। সে ক্ষেত্রে অবশ্য পরে মোহর ঠিক করতে হবে (৪ ঃ৪)।

দালালাতুন-নাস (دَلَالَةُ النَّص) : তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহ হলো দালালাতুন-নাস (دَلَالَةُ النَّص) : এ পদ্ধতিতে পাঠের প্রকৃত ভাব এবং যুক্তির আলোকে শব্দসমূহের অর্থ নির্ধারণ করা হয়, যদিও গৃহীত অর্থের ইঙ্গিত পাঠে উল্লেখ নাও থাকে।

www.pathagar.com

কোরআনের ১৭:২৩ নং আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বৃদ্ধ বয়সী বাবা মার সাথে 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিষয়টি শুধু উফ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং বাবা মার সাথে কোনোরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না–এটিই উক্ত আয়াতের মূল বক্তব্য।

ইকতিদ্বাউন-নাস (اِقْتِضَاءُ النَّص) : চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহ হলো ইকতিদ্বাউন-নাস (اِقْتِضَاءُ النَّص)। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যাপারে পাঠ নিশ্চুপ থাকে, তথাপিও যথাযথ উদ্দেশ্য পূরণার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ অনুমান করে নিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ৪:২৩ আয়াতের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে মা ও কন্যাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে মাতা ও কন্যা বলতে নিজ স্ত্রীর কন্যা বা মাকে বোঝানো হয়েছে। যদি কোনো বিষয়ে পর্যায়গত বিরোধ দেখা দেয় তবে পূর্ববর্তী পর্যায়ের বিধান পরবর্তী পর্যায়ের বিধানের উপর প্রাধান্য পাবে। যেমন ইবারতুন নাস্, ইশারতুন নাসের উপর প্রাধান্য পাবে। এ হচ্ছে হানাফী উসুল বিশেষজ্ঞদের মত।

উসুলের শাফিঈ ওলামারা পাঠের (Text) প্রয়োগকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথাঃ

দালালাতুল মানতুক (دَلاَلَة الْمَنْطُوْق-উচ্চারিত অর্থ) এবং

দালালাতুল মাফহুম (دَلاَلَة الْمَفْهُوْم-আন্তর্নিহিত অর্থ)।

দালালাতুল মানতুক (دَلاَلَة الْمَنْطُوْق-উচ্চারিত অর্থ) : দালালাতুল মানতুক আবার দালালাতুল ইকতিদা (دَلاَلَة الاِقْتِضَاء-প্রয়োজনীয় অর্থ) এবং দালালাতুল ইশারা (دَلاَلَة الاِشَارَة-পরোক্ষ অর্থ) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

দালালাতুল মাফহুম (دَلاَلَة الْمَفْهُوْم-আন্তর্নিহিত অর্থ) : দালালাতুল মাফহুম دَلاَلَة الْمَفْهُوْم আবার মাফহুমুল মুয়াফাকাতি مَفْهُوْمُ الْمُوَافَقَة (সামঞ্জস্যশীল অর্থ) এবং মাফহুমুল মুখতালিফাতি مَفْهُوْمُ الْمُخْتَلِفَة (বিপরীত অর্থ) এ দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

শাফিঈ ওলামারা মাফহুম আল মুখতালিফা শব্দার্থকে গ্রহণ করেন না যদি না তাতে কয়টি শর্ত পূরণ হয়। শাফিঈ ওলামারা সিফাত (صفَة-গুণাবলী), শরত (شَرْط-শর্ত) এবং গায়া (غَايَة-ঝোঁক)–এ সকল ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। তবে দুটি মূলত একই রকম।

হানাফী ওলামারা মাফহুমুল মুখতালিফাতি গ্রহণের ক্ষেত্রে শাফিঈদের চেয়ে বেশি কঠোর। হানাফীরা এ সকল ক্ষেত্রে এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না যা পাঠ কিংবা এর মননের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কোরআন এবং সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই হানাফীরা মাফহুমুল মুখতালিফাতি পদ্ধতিতে অর্থ গ্রহণ করেন না।

www.pathagar.com

আদেশ, নিষেধাজ্ঞা ও রদ

আদেশ (أمْرٌ) :

আদেশকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অধঃস্তন কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু করার মৌখিক দাবি হিসাবে। আদেশ নানান ধরনের হতে পারে।

আদেশ মানেই এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ব্যঞ্জনা থাকবে। আরবি রীতি অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে নিছক অতীতকালে বর্ণিত কোনো বক্তব্য কোনো কিছু করবার জন্য আদেশ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে (২:১৭৮)। নৈতিক অপরাধ বোধের ধরন হিসাবেও কোরআনের হুকুম নাজিল হতে পারে (২:১৮৯)।

কোরআনের আদেশ কোনো পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারে (৪ ঃ ১০-১৪)। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, একটি আদেশে কি থাকে? আদেশ পালন কি বাধ্যতামূলক, সুপারিশমূলক অথবা শুধুই অনুমতি নাকি আদেশ দ্বারা এর সবই বুঝায়? অধিকাংশের মতে আদেশ দ্বারা বাধ্যবাধকতাই বোঝানো হয় যদি না এ ক্ষেত্রে অন্য কিছু করার সুযোগ থাকে। কেউ কেউ বলতে চায় যে, আদেশের দ্বারা শুধু বাধ্যবাধকতা এবং সুপারিশ নির্দেশ করে। অন্য অনেকে বলেন আদেশ দ্বারা শুধু কোনো কিছু করার অনুমতি বোঝায়। পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অধিকাংশের মতামতই যথার্থ এবং যৌক্তিক। অর্থাৎ আদেশ দ্বারা মূলত বাধ্যবাধকতা বুঝায়, ব্যতিক্রম ছাড়া।

আদেশ দ্বারা কোনো সময় অনুমতি (permission) বোঝাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোরআনে যখন বলা হয়, 'খাও এবং পান কর' (৭:৩১), তখন বর্ণনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে এটি নিছকই অনুমতি। অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় ৫:২ নং আয়াতে এবং ৬২:১০ নং আয়াতে। কিছু ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন ২:২৮২ নং আয়াত। স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে আদেশ দ্বারা হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন কোনো বিশেষ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকবার উপদেশ সংবলিত আয়াত (২৪:৩৩) এবং আদেশ দ্বারা আবেদন বা প্রার্থনার নজিরও আছে (২:২৮৬)। যাই হোক, আদেশ দ্বারা মূলত বাধ্যবাধকতাকে নির্দেশ করা হয় (ফরজ, ওয়াজিব)। এটা নির্ভর করে পাঠ এবং এর অর্থ দুটোই কাতঈ কিংবা কাতঈ কিনা তার উপর।

অধিকাংশ ওলামা মনে করেন যে কোনো নিষেধের পর আদেশ আসলে কেবল অনুমতি বুঝায়, বাধ্যতামূলক নয় (৫:২ এবং ৬২:১০)। অধিকাংশের আরেকটি মত হলো, কোনো আদেশ মাত্র একবার পালন করা বাধ্যতামূলক, যদি না বারবার

www.pathagar.com

আদেশটি পূরণের কারণ থাকে। যখন শর্ত সাপেক্ষে আদেশ জারী হয় তখন শর্তপূরণ মাত্রই আদেশটি পালন করা বাধ্যতামূলক (৫:৬)। আবার আদেশ যখন কারণ ও গুণাবলীর উপর নির্ভর করে তখন কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্রই আদেশটি পালন করতে হবে।

আদেশ কার্যকরের সময়কাল তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বযোগ্য, এ সম্পর্কে বলা যায় এটা নির্ভর করে আলোচিত পাঠ এবং এর নির্দেশনার উপর। যদি আদেশটি সময়সীমা নির্দেশ করে না দেয় (যেমন নামাজের সময়কাল) তবে আদেশ পালনে দেরী করা যেতে পারে।

নিষেধ (نَهْيٌ - নাহি) : আদেশের ঠিক বিপরীত হলো নিষেধ । কোনো কিছু না করার দাবিই হলো নিষেধ। নিষেধের ধরন বিবৃতির আকারে হতে পারে (২:২২১) অথবা হতে পারে আদেশের ভঙ্গিতে কিছু না করার জন্য (২২:৩০; ৬২:৯)। নিষেধ হতে পারে সার্বিক নিষেধ (তাহরিম), অথবা পথনির্দেশনামূলক (ইরশাদ), অথবা হতে পারে ভৎর্সনামূলক (তাদিব)। নিষেধ যা তিরস্কার নির্দেশ করে কোরআনে তার উল্লেখ আছে (৫:৮৭)। নৈতিক পথনির্দেশনামূলক নিষেধের উল্লেখ দেখা যায় কোরআনের ৫:১০৪ নং আয়াতে। অধিকাংশের মতে নিষেধ মূলত তাহরীম পর্যায়ের যদি না অন্য কোনোরকম চিন্তা করার মতো ইঙ্গিত থাকে।

কোনো কাজ (আনুষ্ঠানিক ইবাদত ব্যতীত) যদি নিজস্ব কারণে নিষিদ্ধ না হয়ে বরং বহির্ভূত কোনো কারণে নিষিদ্ধ হয় তবে শাফিঈ মতানুযায়ী এটি রদ (رَدٌّ-বাতিল) হয়ে যায় এবং হানাফী মতানুযায়ী এটি ফাসিদ বলে বিবেচিত হয়। বাতিল অর্থ এটা আর সংশোধন করা যাবে না। ফাসিদ অর্থ সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত পূরন করা হয়নি এবং তা পূরন করলে বিষয়টি সহীহ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফাসিদ সংশোধন যোগ্য। কিন্তু ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে এ অবস্থান ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে ফাসিদ ও বাতিল সমপর্যায়ভুক্ত। অন্য কথায়, এখানে শুধু বাতিল ঘটে, ফাসিদ হয় না।

নিষেধাজ্ঞা পালন অত্যাবশ্যকীয় এবং যখনই এ আদেশ মেনে চলা প্রযোজ্য হবে তখনই তা মেনে চলতে হবে। নিষেধাজ্ঞা যদি শর্ত সাপেক্ষ হয় তবে যখনই শর্ত বর্তমান হবে তখনই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। নিষেধাজ্ঞা যখন কোনো আদেশের অনুবর্তী হবে তখন নিষেধাজ্ঞাটি তাহরীম পর্যায়ভুক্ত হবে।

সরিহ বা স্পষ্ট হুকুম হতে পারে [(أَمْر আমর) বা (نَهْي নাহি)] পুরোপুরি মেনে চলা দাবি করে। শুধু শাব্দিক অর্থ নয় বরং আইনের স্পিরিট আইন কার্যকরের সময় সামনে থাকা দরকার (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ-ফাসআও ইলা জিকরিল্লাহ, ৬২:৯)। হুকুম সরিহ (صَرِيْح) না হলে বা হুকুম যদি না অন্য কোথাও বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয় তবে তা ওলামা কর্তৃক হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ওলামাদের মাঝে মতদ্বৈততা দেখা দিতে পারে। শুধুমাত্র পাঠের একটি ক্ষুদ্র অংশ স্পষ্টভাবে অর্থ প্রকাশ করে। পাঠের বৃহদাংশ শরীয়তের সাধারণ মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের আলোকে মুজতাহিদগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

নাস্‌খ্ (نَسْخ-রদ) শাব্দিক অর্থে নাস্‌খ্ অর্থ হলো বিলোপ সাধন। নাস্‌খ্‌কে সংজ্ঞায়িত করা হয় শরীয়াহর একটি বিধান অন্য একটি বিধান দ্বারা বাতিল হওয়া বা প্রতিস্থাপিত হওয়া দ্বারা। একমাত্র বিধানাবলীর ক্ষেত্রেই নাস্‌খ্ কার্যকর হয়, বিশ্বাসের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নয়। নাস্‌খ্ কার্যকর হয় শুধুমাত্র-

- যদি দুটো নজির একই রকম শক্তিশালী হয়;
- নজির দুটো যদি ভিন্ন পাঠে (text) উল্লেখিত হয়;
- নজির দুটোর মধ্যে যদি প্রকৃত বিরোধ থাকে এবং কোনোভাবেই সমন্বয় সম্ভব না হয়;
- এবং নজির দুটো দুই সময়কালের হয়।

কিছু ওলামা স্বীকার করেন না যে কোরআনের কোনো আয়াত রদ বা বাতিল হয়েছে। এ শ্রেণীভুক্ত ওলামাদের মতে কোরআনের ২:১০৬নং আয়াতে উল্লেখিত রদ সম্পর্কিত বক্তব্য কোরআনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বরং পূর্ববর্তী কিতাবের জন্য প্রযোজ্য। তারা আরো বলেন, কোরআনের তথাকথিত বিরোধের সমন্বয় সাধন সম্ভব। মুহাম্মদ আসাদ এবং মাওলানা আকরম খাঁ তাদের কোরআনের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন কোরআনের কোনো নাসখ নেই। প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান মনে করেন, প্রাথমিক যুগের ওলামারা নাস্‌খ্‌কে ইতিহাসের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে না দেখে স্থায়ী মতবাদের মর্যাদা প্রদান করে ভুল করেছেন। তিনি ধারণা দেন যে, নাস্‌খের ব্যবহার শুধুমাত্র পরিষ্কার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকা দরকার, যেমন কিবলা পরিবর্তন।

অধিকাংশ ওলামার মতে কোরআন ও সুন্নাহর ক্ষেত্রে নাস্‌খ কার্যকর হয়েছে। তাদের মতে ইজমা (إِجْمَاع) দ্বারা কোরআনের কোনো বিধান (نَسْخ)রদ হয় না। কোরআন ও সুন্নাহর কোনো পাঠকে কিয়াসও প্রতিস্থাপন করতে পারে না। ইমাম শাফিঈর মতে দুই ধরনের নাসখ আছে:

- কোরআন দ্বারা কোরআন রদ; এবং
- সুন্নাহর দ্বারা সুন্নাহ রদ।

অন্যদের মতে চার ধরনের নাস্‌খ্ আছে:

- কোরআন দ্বারা কোরআন
- সুন্নাহর দ্বারা কোরআন
- কোরআন দ্বারা সুন্নাহ্
- সুন্নাহ্ দ্বারা সুন্নাহ্

www.pathagar.com

তবে এটাই সঠিক মত বলে মনে হয় যা ডঃ আব্দুল হামিদ বলেছেন। নিচের ক্ষেত্রগুলোতে এর বাইরে আরেক ধরনের শ্রেণী বিভাজন আছে।

- নাস্‌খুল হুক্‌ম (نَسْخُ الْحُكْمِ) বা বিধান রহিত করণ
- নাস্‌খুল কিরাআহ্‌-(نَسْخُ الْقِرَائَة) বা পাঠের রহিত করণ
- নাস্‌খুল হুকমি ওয়াত তিলাওয়াহ-(نَسْخُ الْحُكْمِ وَالتِّلاَوَةِ) বা বিধান ও পাঠ উভয়ই রহিত করণ।

নাস্‌খুল হুকম বলতে বোঝায়, বিধানটি বাতিল হয়েছে কিন্তু পাঠটি রয়ে গেছে। **নাস্‌খুল কিরাআহ্‌** বলতে বোঝায়, পাঠটি রদ হয়ে গেছে কিন্তু বিধানটি রয়ে গেছে। **নাস্‌খুল হুকমি ওয়াত তিলাওয়াহ** বলতে বোঝায়, পাঠ এবং বিধান উভয়ই বাতিল হয়ে গেছে। উপরের তিনটি শ্রেণীকরণের মধ্যে নাসখুল হুকমর কিছু ভিত্তি আছে কিন্তু বাকি দুটোর ভিত্তি খুবই দুর্বল। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর 'রাসায়েল ওয়া মাসায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কেন নাস্‌খুল-কিরাআহ্‌ গ্রহণযোগ্য নয়।

نَسْخ নাস্‌খ এবং তাখ্‌সীরের (সাধারণ পাঠের বিশেষায়ন অথবা গুণারোপ) মধ্যে পার্থক্য আছে। তাখ্‌সীরের ব্যাপারে কোনো বাস্তবিক বিরোধ নেই। আরেকটি বিচার্য বিষয় হলো তাজিদ (সংযোজন) বাতিল যোগ্য কিনা? অধিকাংশের মতে উত্তর হলো না, এ মতই যথার্থ।

সর্বোপরি আমি মনে করি এই সকল বিষয়ে ড. আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান এর অভিমত বিবেচনার দাবি রাখে।

www.pathagar.com

ইজমা

আরবি শব্দ 'আজমাআ' এর বাচনিক বিশেষ্য রূপ হলো ইজমা (إِجْمَاع)। শব্দটির দুটো অর্থ আছে। প্রথমতঃ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং দ্বিতীয়ত মতৈক্য পৌঁছানো। কোরআন ও সুন্নাহর পর ইজমাকে ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইজমা শরীয়তের যৌক্তিক সাক্ষ্য। এক অথবা কতিপয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক গৃহীত ইজতিহাদ বা ব্যাখ্যা যখন সার্বজনীনভাবে গৃহীত হয় তাই ইজমা।

উসুলের ওলামাগণ ইজমার যে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেখানে একটা বিষয়ে ব্যতিক্রমীভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তা হলো- মুসলিম বিশ্বের সকল বিশেষজ্ঞ কোনো বিষয়ে সার্বিকভাবে ঐক্যমত পোষণ করলে তা চূড়ান্ত ইজমা বলে বিবেচিত হবে। প্রাথমিক যুগের উসুলিউনদের মতে একমাত্র এইরূপ চূড়ান্ত ইজমাই সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। যাইহোক, এরূপ সার্বিক ইজমার ঘটনা খুবই বিরল। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে যা ইজতিহাদ বা তাবিলের জন্য উন্মুক্ত সে ক্ষেত্রে ইজমার ঘটনা ঘটা প্রকৃতই দুষ্কর। ইসনাদের মাধ্যমে ইজমার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশেষজ্ঞরা ইজমার যে উদাহরণগুলো তুলে ধরেন তা হলো সাহাবীগণ কর্তৃক গৃহীত ইজমা। উসুলের অধিকাংশ ওলামা মনে করেন যে ইজমা আইনগত (হুদূদ) ইবাদাহ ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়ে হতে পারে। প্রথম ইজমা গৃহীত হয় সাহাবীদের মাঝে। কিছু বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে একতা বজায় রাখবার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ইজমা সহায়তা করে। সঠিক নয় এমন কোনো বিষয়ে ব্যাপক ঐক্যমত হতে পারে না বিধায় অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যা ইজমার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। কোনো বিধানের কর্তৃত্ব ইজমার মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো বিষয়ে ওলামাদের মাঝে ঐক্যমত ইজমার জন্য প্রয়োজনীয়। ঐ সময়ের সকল ওলামা পরিষ্কার মতামতের মধ্য দিয়ে সম্মতি প্রদান করবে। সকল মুজতাহিদের সম্মতির ভিত্তিতেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত, যদিও অনেকে মনে করেন সকলে নয় অধিকাংশের সম্মতিতেই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হবে।

অধিকাংশের সম্মতি শরীয়াহ আইনের একটি দলিল হতে পারে কিন্তু তা বাধ্যতামূলক দলিল নয়। কেননা বাধ্যতামূলক ইজমার জন্য হাদিসে যে সকল শর্তের উল্লেখ আছে তা পূরণ হতে হবে (সকল মানুষের ইজমা, নিদেনপক্ষে সকল বিশেষজ্ঞের সম্মতি)।

সকল ওলামাই মনে করেন যে, ইজমা প্রতিষ্ঠার সপক্ষে পাঠগত (textual) যে প্রমাণ বর্তমান তা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইজমার স্বপক্ষে যে সকল আয়াতের উল্লেখ করা হয় (৪:৫৯, ৪:৮৩, ৪:১১৫ ইত্যাদি) তার কোনোটি থেকেই ইজমা প্রতিষ্ঠার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। ইমাম গাযালী এ সকল

www.pathagar.com

আয়াতকে ইজমা প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইঙ্গিতপূর্ণ, তবে চূড়ান্ত নয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ুতির ব্যাখ্যাও অনুরূপ। ইমাম মুহাম্মদ আব্দুহ এ সকল আয়াতে ইজমা প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পায়নি। আল আমিদি বলেছেন, 'এ সকল আয়াত সম্ভাবনার সৃষ্টি করে, কোনো জ্ঞান দান করে না।'

প্রায় দশটি হাদিস ইজমার স্বপক্ষে উল্লেখ করা হয়। আহমেদ হাসানের পর্যবেক্ষণ হলো ইজমার স্বপক্ষে এ সকল হাদিস অকাট্য নয়। একটা বড় সংখ্যক ওলামা (শাফিঈ এবং মুতাজিলা পন্থি) মনে করেন ওলামাদের সংখ্যাধিক্য এবং দূরত্বের ব্যাপকতার কারণে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইজমা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ কারণে ইমাম শাফিঈ বাধ্যবাধকতামূলক কর্তব্যের ক্ষেত্রেই ইজমার প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করেছেন। সে একই কারণে, দাউদ জাহিরী এবং ইমাম আহমদ ইজমা দ্বারা সাহাবীদের ঐকমত্য বুঝিয়েছেন।

আবদুল ওহাব খাল্লাফ মত দেন যে, ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইজমা বর্তমান সময়কালে সম্ভব নয় (কেননা প্রচুর সংখ্যক ওলামা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বর্তমান)। আবদুল ওহাব খাল্লাফ যথার্থই বলেছেন। পুরানো ধাঁচের ইজমা বর্তমানে সম্ভব নয়। বর্তমানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ইজমা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব, কিন্তু এ আইন চিরন্তণ নয়।

ইজমা দু'ধরনের। যথা :

ইজমাউস আল সরিহ (বাহ্যিক ইজমা) এবং

ইজমাউস সুকুতি (নীরব ইজমা)।

অধিকাংশ ওলামাদের মতে আল ইজমাউস সুকুত (এ ব্যাপারটি ঘটে তখনই যখন এক বা কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ কোনো ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছায় এবং এ ব্যাপারে কোনো বিরোধিতা দেখা দেয় না) শরীয়তের বাধ্যতামূলক প্রমাণ হিসাবে পরিগণিত হবে না। কিয়াস ইজমার ভিত্তি হতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বলেন হতে পারে, কেউ বলেন না, আবার কেউ আংশিকভাবে হ্যাঁ বলেন।

বিশেষজ্ঞদের আহাদ অথবা মুতাওয়াতির বর্ণনার মাধ্যমে ইজমা বর্ণিত হতে পারে। সাহাবীদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইজমার উদাহরণ ব্যতিত আর কোনো মুতাওয়াতির ইজমার উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোহাম্মদ ইকবাল প্রস্তাব দিয়েছেন যে ইজমা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি পার্লামেন্টের উপর ছেড়ে দেয়া হোক, বর্তমানকালে একমাত্র এভাবেই ইজমা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল এ ক্ষেত্রে যথার্থ বলেছেন, তার ধারণা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এভাবে গৃহীত ইজমা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃতি পাবে না এবং এটাকে বাধ্যতামূলক ভাবা যাবে না (যদি না গৃহীত ইজমাটিকে আইনের মর্যাদা দেয়া হয়)।

উপসংহারে বলা যায়, ভবিষ্যতে ইজমার ব্যবহার সংকীর্ণ হতে পারে। বরং কিয়াস, ইসতিহসান, মাসলাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

www.pathagar.com

কিয়াস

শাব্দিক অর্থে কিয়াস বলতে বোঝায় কোনো কিছুর ব্যাপ্তি, ওজন অথবা গুণাবলীর পরিমাপকরণ অথবা নিশ্চিতকরণ। কিয়াস বলতে আরো বোঝায় দুটো দ্রব্যের মধ্যে সাম্য এবং সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করতে তুলনা করা। উসুলের ভাষায় কিয়াস হলো মূল ঘটনা (أَصْل-আসল) থেকে নতুন ঘটনাতে (فَرْع-ফার) শরীয়াহ আইনের সম্প্রসারণ, কারণ নতুন ঘটনার কার্যকারণ (ইল্লাত) আসল ঘটনার অনুরূপ।

নতুন ঘটনাটি মূল ঘটনাটির পাঠ দ্বারা উপযোযিত হয়। কিয়াসের গুরুত্বারোপের বিষয় হলো মূল ঘটনা এবং নতুন ঘটনার মাঝে সাধারণ কারণ খুঁজে বের করা। কিয়াসের মাধ্যেমে গঠিত আইনকে আইনবিদেরা নতুন আইন হিসাবে বিবেচনা করেন না। যাইহোক, সকল বাস্তব প্রয়োজনে ভিন্ন বিষয়ে কিয়াস নতুন আইনের দিকে ধাবিত হয়।

কিয়াস আইনবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত এক ধরনের পদ্ধতি যার মাধ্যমে নতুন ক্ষেত্রে গঠিত আইন কোরআন ও সুন্নাহর নিকটবর্তী হয়। কারণ এ সকল নতুন আইন যে কার্যকারণের (ইল্লাত) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা কোরআন ও সুন্নাহর বিধান থেকে উদ্ভাবিত।

কিয়াসকে যদি প্রয়োগ করা না হতো তবে নতুন ক্ষেত্রে রচিত আইন কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আরো দূরে চলে যেত। এটাই কিয়াসের যথার্থতার যুক্তি।

কিয়াস হলো যৌক্তিক মতবাদ (কারণ বুদ্ধিবৃত্তি ব্যাপকভাবে ইল্লাত অন্বেষণে ব্যবহৃত হয়)। কিন্তু কিয়াসে ব্যক্তিগত মতামত (রায়) ও ওহীর বশ্যতা স্বীকার করে (কোরআন ও সুন্নাহ থেকে ইল্লাত উদ্ভাবিত হয়)। তরান্বিত করবার জন্য কিয়াস কোরআন কিংবা সুন্নাহর কোনো আইন পরিবর্তন করে না। কিয়াস একটি পদ্ধতি। কিয়াসকে আইনবিদেরা এই অর্থে স্বীকৃতি দিয়েছে যে শরীয়াহর বিধান কতিপয় উদ্দেশ্য (مَقَاصِدْ-মাকাসিদ) অনুসরণ করে যা যুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাহিরী (ظَاهِرِى-) আলেমগণ কিয়াসকে গ্রহণ করেননি। কিন্তু অধিকাংশ আলেম কিয়াসের ব্যাপারে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

কিয়াস নিশ্চয়তা প্রদান করে না। কিয়াস তাই অনুমান নির্ভর। কোরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত আইনের অনুরূপ কর্তৃত্ব কিয়াস থেকে গৃহীত আইনের নেই। কিয়াসের মাধ্যমে গৃহীত আইনের ব্যাপারে নানারকম মত আছে, যেমন মতভিন্নতা আছে প্রায় সকল ইজতিহাদি আইনের ব্যাপারে। কিয়াসের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হলো আসল (মূল বিষয়, যার উপর ভিত্তি করে রায় দেয়া হয়েছে), হুকুম, (রায়), ইল্লাত (যে কার্যকারণের প্রেক্ষিতে রায় প্রদান করা হয়) এবং ফার (নতুন ঘটনা যার উপর রায় প্রদান করা হবে)। এ ক্ষেত্রে মদ পানের নিষেধাজ্ঞার

www.pathagar.com

ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে (মায়েদা : ৯০)। এ বিধানটি চেতনানাশক অন্যান্য মাদকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। সাদৃশ্যের কারণ নিম্নোক্ত ধাপের মাধ্যমে সম্ভব।

আসল (أَصْل-মূল বিষয়)	ফার (فَرْع-নতুন বিষয়)	ইল্লাত (عِلَّة রায়ের কারণ)	হুকুম (حُكْم রায়)
মদ পান	চেতনানাশক মাদক	মাদকতার ফল	নিষেধাজ্ঞা

আসলের একটি শর্ত হলো কোরআন এবং সুন্নাহ আসলের উৎস। অনেক বিশেষজ্ঞই ইজমাকে আসলের ভিত্তি মনে করেন না। অধিকাংশের মতে একটি কিয়াস অন্য একটি কিয়াসের আসল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে মালিকি আইনবিদ ইবনে রুশদ মনে করেন একটি কিয়াস অন্য আরেকটি কিয়াসের আসল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আধুনিক আইনবিদ আবু যাহরা এবং মোহাম্মদ আল যারকা এ মত সমর্থন করেন। অল্প সংখ্যকের মতও সঠিক হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা কোরআন ও সুন্নাহর নাস্ এর সাথে সাংঘর্ষিক না হয়।

হুকুমের শর্তসমূহ:

১. এটা অবশ্যই আইনগত রায় হতে হবে (আকীদাগত ক্ষেত্রে কিয়াস কোনো রায় দিতে পারে না)।
২. বাতিল হয়ে গেছে এমন কোনো রায় হতে পারবে না।
৩. মানবীয় বুদ্ধির আলোকে বোধগম্য হতে হবে।
৪. হুকুম কখনোই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে না (এরূপ ক্ষেত্রে এটি কিয়াসের ভিত্তি হতে পারে না)।

অধিকাংশের মতে কিয়াস হুদুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য।

যেখানে Text-এর বিধিবিধান আছে সেখানে কিয়াস নেই। কিয়াস মা'আল তারিক (ত্রুটিপূর্ণ কিয়াস) অনুমোদনযোগ্য নয়।

ইল্লাতকে অবশ্যই নিম্নোক্ত শর্ত পূরণ করতে হবে:

১. মুনাসিব (مُنَاسِب মুজতাহিদদের মতে যথার্থ হতে হবে)
২. এর অপরিবর্তনীয় গুণ থাকতে হবে (মুনজাবিদ)।
৩. এটা অবশ্যই প্রতীয়মান হতে হবে (যাহির)।

অধিকাংশের মতে ইল্লাহ অবশ্যই নতুন ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য (مُتَعَدِّى-মুতাআদ্দি)। কেউ কেউ তাদিয়া (হস্তান্তর) সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন কার্যকারণ নাস-এর উল্লেখ থাকতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনার সংখ্যা বেশি নয়।

www.pathagar.com

আরবি প্রকাশরীতি অনুযায়ী কাইলা كَيْلَا (এরূপ না), লি আজলি (لِأَجْلِ কারণ), লি (জন্য), ফা (فَ-এরূপ), বি (بِـ-কারণ), বিমা আন্না (بِأَنَّ) ইন্না (إِنَّ) ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই ইল্লাতকে নির্দেশ করে (৪:৩৪, ৫:৩৮)। আরবি শব্দ সাবাব (কারণ) ইল্লাত শব্দের প্রতিস্থাপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কেউ কেউ শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। পার্থক্যটি উল্লেখযোগ্য কিংবা পরিষ্কার নয়। যাইহোক ইল্লাত শব্দটি ব্যবহারের দিক থেকে ব্যাপকতা পেয়েছে।

পাঠ থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে রায় দেবার জন্য নাসের (نَصّ) যখন ইল্লাত স্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকে না, তখন মুজতাহিদদের দায়িত্ব ইল্লাত খুঁজে বের করা। দুই ধাপে এটা করা সম্ভব। সূচনা বিন্দু হলো "তাখরীজুল মানাত্ব" (ইল্লাহর আরেকটি প্রতিশব্দ হলো মানাত্ব)।

রায় দেবার সময় একের বদলে একাধিক ইল্লাতের উপস্থিতি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুজতাহিদদের করণীয় হলো ভুল ইল্লাত পরিহার করে যথার্থ ইল্লাত খুঁজে বের করা। প্রক্রিয়াটিকে তানকিহ আল মানাত বলে (ইল্লাতকে স্বতন্ত্রকরণ)।

নতুন ঘটনার ক্ষেত্রে যেখানে রায়ের সম্প্রসারণ ঘটবে সেখানে তাহকীকুল মানাত ইল্লাত আছে কি নাই এ অনুসন্ধানের সমন্বয়ে গঠিত হয় (সাধারণ চুরির সাথে পকেটমারের সাদৃশ্যকরণ সম্ভব কিনা অথবা ভেজষ পানীয়র ইল্লাত কি মদের অনুরূপ)।

কিয়াসের শ্রেণীবিন্যাস

কিয়াসের এক ধরনের শ্রেণী বিন্যাস হলো :

১. কিয়াস আল আওলা (القِيَاسُ الأَوْلَى-উন্নত ধরনের কিয়াস)
২. কিয়াস আল মুসাবী (اَلْقِيَاسُ الْمُسَوّى-সাম্যের সাদৃশ্যকরণ)।
৩. কিয়াস আল আদনা (اَلْقِيَاسُ الأَدْنَى-নিকৃষ্টের সাদৃশ্যকরণ)।

কিয়াস আল আওলা বলতে এমন ধরনের কিয়াস যেখানে আসল ঘটনা অপেক্ষা নতুন ঘটনাতে কার্যকারণ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান (১৭:২৩)।

কিয়াস আল মুসাবী হলো এমন ধরনের কিয়াস যেখানে আসল ও ফার فَرْعٌ উভয় ক্ষেত্রেই ইল্লাত সমানভাবে প্রতীয়মান নয় (৪:২)।

কিয়াস আল আদনা বলতে এমন ধরনের কিয়াস যেখানে ইল্লাত ফার'এর ক্ষেত্রে আসলের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয়।

কিয়াসের আরেক ধরনের শ্রেণীকরণ হলো:

১. কিয়াস জালি (قِيَاس جَلِى-অবশ্যম্ভাবি সাদৃশ্যকরণ)
২. কিয়াস খাফি (লুক্কায়িত সাদৃশ্যকরণ)।

www.pathagar.com

অধিকাংশের দ্বারা কিয়াস স্বীকৃতি পেয়েছে, যার মধ্যে চারটি সুন্নী মাযহাব সহ যাইদি শিয়ারা আছে। কোরআনের ৫৯:২ নং আয়াতে কিয়াসের স্বপক্ষে প্রমাণ আছে এবং ইঙ্গিতময় আয়াত আছে ২:৭৯ ও ৪:১০৫ নং আয়াতে। সুন্নাহও কিয়াসকে সমর্থন করে, সুন্নাহতে ইজতিহাদের কথা বলা আছে আর কিয়াস ইজতিহাদের একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি।

অনেক যাহিরী দার্শনিক গোষ্ঠী কিয়াসের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন। তারা এই বলে কলহ করে যে, কোরআন কিয়াসের বিরুদ্ধে (৫২:২; আমরা কোরআনে কোনো কিছুই অবহেলা করি নাই)। তারা আরো বলে, কিয়াসের ভিত্তি হলো ইল্লাত এবং ইল্লাহর ভিত্তি হলো অনুমান। তারা কোরআনের ৪৯:১ নং আয়াত উল্লেখ করে বলেন কোরআন কিয়াসের বিরুদ্ধে। এ সমস্তই খুব দুর্বল যুক্তি এবং উম্মাহর অধিকাংশই তাদের মত গ্রহণ করেনি। অধিকাংশ মনে করেন হুদুদের ক্ষেত্রে কিয়াস প্রয়োগযোগ্য। হানাফীরা মনে করেন কিয়াস তাযির এর ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য, হুদুদের ক্ষেত্রে নয়। হানাফী মত এ ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক।

অধিকাংশের মত হলো নাস্ (text) যেখানে আছে কিয়াস সেখানে অতিরিক্ত। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন যে কোরআন ও সুন্নাহ অনুমানকে বিশেষীকৃত বা গুণারোপ (specified বা qualified) করতে পারে। কিছু ওলামা মনে করেন যে, কিয়াস যদি কোনো শক্তিশালী প্রমাণ দ্বারা সহায়তা পায় তবে তা একক হাদিসের চেয়ে প্রাধান্য পেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে ইসতিহসান এবং মাসলাহা ইজতিহাদের একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ রূপ হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী শরীয়াহ পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্ট আইন

ইসলাম বিশ্বাস করে স্রষ্টার প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত (৪২:১৩)। কোরআন স্বীকৃতি দেয় যে তাওরাত পথনির্দেশনার উৎস ছিল (৫:৪৪)। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোরআন নাজিল হবার পরে পূর্ববর্তী এসব কেতাবকে আইনের উৎস বলতে কি বোঝায়? সাধারণ ভাষ্য হলো, কোরআনের পূর্বে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল তা আর বর্তমানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (নিম্নে উল্লিখিত ব্যতিক্রম ব্যতীত)।

ইসলামের আহকাম স্বয়ংসম্পূর্ণ। শরীয়াহর আইন কোরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কোথাও খোঁজার প্রয়োজন নেই, কারণ অন্য ধর্মের আইন মুসলিমদের জন্য মানা বাধ্যতামূলক নয়।

কোরআন তিনভাবে পূর্ববর্তী শরীয়াহর উল্লেখ করেঃ

১. কোরআন পূর্ববর্তী শরীয়াহর উল্লেখ করতে পারে এবং উল্লেখিত বিষয়টিকে মুসলিমদের বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের জন্য রোজার নির্দেশ ছিল এবং মুসলিমদের জন্য তা নির্দেশ করা হয়েছে (সূরা বাকারা ২:১৮৩)। পূর্ববর্তী শরীয়াহ্‌র এরূপ বিধান বর্তমান শরীয়াহ্‌রও অংশ।

২. কোরআন (বা সুন্নাহ) পূর্ববর্তী শরীয়াহ্‌র কোনো বিধানের উল্লেখ করতে পারে এবং বর্তমানে তা রদ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খাদ্যবিষয়ক কতিপয় নিষেধাজ্ঞা ইয়াহুদি সম্প্রদায়ের প্রতি ছিল যা কোরআনের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য প্রত্যাহার করা হয়েছে (৬:১৪৬)। মুসলিমরা এ বিষয়ে পূর্ববর্তী শরীয়াহর আইন অনুসরণ করতে পারে না।

৩. পূর্ববর্তী শরীয়াহর কোনো একটি আইন বহাল আছে কিংবা রহিত হয়েছে এর উল্লেখ না করেই কোরআন পূর্ববর্তী শরীয়াহর কোনো আইনের উল্লেখ করতে পারে (৫:৪৫ ও ৫: ৪৮)। অধিকাংশ ওলামা এসকল বিধানকে বর্তমান শরীয়াহ্‌র ও অংশ বলে মনে করে এবং তা অনুসরণীয় বলে মনে করে। সংখ্যালঘু মত পূববর্তী মতের বিপরীত। ড. হাশিম কামালির মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত এ ক্ষেত্রে যথার্থ।

www.pathagar.com

সাহাবীদের ফতওয়া

শরীয়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবীদের ফতোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বোচ্চ বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ হলো সাহাবীরা রাসূল (সা) এর অতি নিকটবর্তী ছিলেন এবং তাদের জ্ঞান সরাসরি রাসূল (সা) থেকে গৃহীত হয়েছিল। তবে সাহাবী বলতে কাদের বোঝানো হবে তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে বিশ্বাসী যাঁরাই রাসূল (সা) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা সকলেই সাহাবীর মর্যাদাভুক্ত। সংখ্যালঘিষ্টের মতে কোনো ব্যক্তিকে সাহাবীর মর্যাদা পেতে হলে 'সুহবাত' (صُحْبَة-সংসর্গের ধারাবাহিকতা) একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। দুটো মতেরই যৌক্তিকতা আছে এবং কোনোটিকেই অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। কোনো ব্যক্তি সাহাবী কিনা তা প্রতিষ্ঠা পেতে পারে অন্য কোনো সাহাবীর সত্যায়ন বা সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে বা নিজ কর্তৃক দাবির মাধ্যমে (এ ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিটিকে সত্যবাদী হতে হবে)।

সাহাবীদের ফতোয়া বলতে তাঁদের মতামতকে বোঝায় যা কোনো সাহাবী ইজতিহাদের মাধ্যমে উপনীত হয়েছেন। সাহাবীদের ফতোয়া পরবর্তী বংশধরদের জন্য প্রামাণ্য। এ বিষয়ে তিনটি মতামত আছে।

প্রথম মত হলো, এটি অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ। এ মতপন্থিরা কোরআনের ৩:১১০ এবং ৯:১০০ নং আয়াতদ্বয়কে আমার অনুসারীরা তারকাসমৃদ্ধ এবং আমার সাহাবীদেরকে সম্মান কর হাদিসদ্বয়কে উল্লেখ করেন। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম মালিক। ইমাম শাফিঈ এবং আহমদ বিন হাম্বালকেও এ মতের স্বপক্ষে উল্লেখ করা হয়। এ মতের বিরোধী যারা তারা বলতে চান এ সকল উক্তি দ্বারা সাহাবীদের মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। সাহাবীদের আদেশ মানা বাধ্যতামূলক তার স্বপক্ষে এ সকল প্রমাণ কাতঈ পর্যায়ভুক্ত সাক্ষ্য নয়।

দ্বিতীয় মত হলো, সাহাবীদের ইজতিহাদ শরীয়াহর কোনো প্রমাণ নয় এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্য তার অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। হানাফী আইনবিদ আবুল হাসান আল কারখি, ইমাম আহমদ (তাঁর এক মতানুসারে), আশারী এবং মুতাজিলা বিশেষজ্ঞরা এ মত ধারণ করেন। এ মতপন্থিরা যুক্তি দেন যে, যে আয়াত দ্বারা ইজতিহাদকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা যোগ্য সকলের জন্য প্রযোজ্য। এখানে সাহাবী কি সাহাবী নয় তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা হয়নি। ইমাম গাযালী এবং আমিদি এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমার মতেও এ মত ঠিক।

www.pathagar.com

তৃতীয় মতের ধারক ইমাম আবু হানীফা (রা) স্বয়ং। তাঁর বক্তব্য হলো কিয়াসের সাথে যদি কোনো সাহাবীর মতামতে অনৈক্য দেখা দেয়, তবে সাহাবীর মতই প্রামাণ্য হবে, কিন্তু যদি মতৈক্য দেখা দেয় তবে নয়।

উসূল সাহিত্যে উপরোল্লিখিত মতত্রয়ের বাইরেও আরো কতিপয় মতামত দেখা যায়।

এ থেকে উপসংহার টানা যেতে পারে যে, সাহাবীদের মতামত পথনির্দেশনার উৎস। সতর্কতার সাথে এসব ফতোয়ার দোষগুণ বিবেচনার দাবি রাখে যদিও পরিস্কার ইজমা ব্যতিত এ সকল ফতোয়া মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়।

www.pathagar.com

ইসতিহ্সান

ইসতিহসান (আইনগত অগ্রাধিকার):

শাব্দিক অর্থে ইসতিহসান (إستحسان) হলো কোনো কিছুকে অগ্রাধিকার দেয়া। আইনগত অর্থে ইসতিহসান হলো আইনের শাব্দিক প্রয়োগ থেকে উদ্ভূত কঠোরতা এবং অস্বচ্ছতা পরিহার করে ব্যক্তিগত মতামতকে (রায়) প্রয়োগ করার পদ্ধতি। ধারণাগত দিক থেকে ইসতিহসান পশ্চিমা আইনে ব্যবহৃত সাম্য (equity) শব্দের কাছাকাছি। পশ্চিমা আইনে সাম্য শব্দটি প্রাকৃতিক আইনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু ইসতিহসান গড়ে উঠেছে ওহির উপর ভিত্তি করে।

ইসতিহসান শরীয়াহ হতে স্বাধীন নয় বরং শরীয়াহরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মেটানোর জন্য ইসতিহসান আইনের একটি অপরিহার্য অংশ। হানাফী, মালিকি এবং হাম্বলী মাযহাবের আইনবিদ কর্তৃক ইসতিহসান স্বীকৃতি পেয়েছে। আবার শাফিঈ, শিয়া এবং জাহিরী মাযহাবের আইনবিদ কর্তৃক ইসতিহসান অনুমানের একটি পদ্ধতি হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। যাই হোক বাস্তবতা হলো অধিকাংশ ওলামা কর্তৃক ইসতিহসান স্বীকৃত।

ইসতিহসানের উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত ওমর (রা) কর্তৃক দুর্ভিক্ষের সময় চুরির অপরাধে হুদুদ আইনে দণ্ডিতের হাত কাটার শাস্তি স্থগিত করার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। এখানে একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ইসলামের একটি নির্দিষ্ট আইনকে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ হিসাবে স্থগিত করা হয়। একজন অন্যতম আইনবিদ আল সারাখসী (سرخسى) ইসতিহসানকে গণ্য করেন এমন একটি পদ্ধতি হিসাবে যার মাধ্যমে কোরআনের সহিত সংগতি রেখে আইনি হুকুমকে সহজ করা হয় (২:১৮৫)। ড. হাশিম কামালী উল্লেখ করেছেন, সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ শুধুমাত্র আক্ষরিক অনুসরণকারী ছিলেন না। প্রায়ই তাঁদের প্রদত্ত রায় শরীয়াহর মূল ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের আলোকে প্রদান করেছেন তাঁরা। ড. হাশিম কামালী ইসতিহসানের একটি নতুন উদাহরণ দিয়েছেন। ইসলামী আইনে কেবল মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে আলোকচিত্র, রেকর্ডকৃত শব্দ এবং গবেষণাগারেকৃত বিশ্লেষণ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসতিহ্সান পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্যের চেয়ে আধুনিক পদ্ধতিকে অধিকতর প্রাধান্য দিতে পারি।

হানাফী আইনবিদ আবুল হাসান আল কারখী ইসতিহ্সানকে সংজ্ঞায়িত করেছেন অধিকতর যুক্তিসংগত কারণে একটি প্রতিষ্ঠিত নজির থেকে ভিন্ন রায়ে স্থানান্তরের নীতি হিসাবে। মালিকী আইনবিদেরা ইসতিহসান অপেক্ষা ইসতিসলাহর ব্যাপারে

www.pathagar.com

অধিকতর আগ্রহী। তাদের মতে ইসতিহ্সান কম বেশি ইসতিসলাহর অনুরূপ বা ইসতিসলাহর একটি অংশ।

কোরআন ও সুন্নাহতে ইসতিহসানের সমর্থনে কোনো কাতঈ প্রমাণ নেই। তবে কোরআনের ৩৪:১৮ এবং ৩৯:৫৫ নং আয়াতদ্বয় ইসতিহ্সানের সমর্থনে উল্লেখ করা হয়। একইভাবে একটি বিখ্যাত হাদিস "লা দ্বারারা ওয়া লা দ্বিরারা ফিল ইসলাম" لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِى الإِسْلاَمِ [ইসলামে কোনো অসুবিধা আরোপিত বা সহ্য করা হবে না] ইসতিহসানের সমর্থনে উল্লেখ করা হয়। ইসতিহসান ঘনিষ্টভাবে রায় এবং কিয়াসের সাথে সম্পর্কিত। কিয়াস এবং ইসতিহসানে রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, ইসতিহ্সানের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি প্রযোজ্য।

সাহাবীরা সুন্নাহকে বিসর্জন দিয়ে রায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক ছিলেন। আহলে হাদিসপন্থিরা রায় প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে অধিকাংশ ফুকাহারা আইনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে রায় এর প্রয়োগ ঘটাতো এবং তারা আহলুর রায় (أَهْلُ الرأي) বলে পরিচিত।

অনেকেই মনে করেন যে, এক ধরনের ইসতিহ্সান মূলত কিয়াস খাফি قِيَاس خَفِى)। তারা মনে করেন যে, ইসতিহসান হলো কিয়াস জালি (قِيَاس جَلِى) থেকে কিয়াস খাফিতে (قِيَاس خَفِى) পৌছা। আরেক ধরনের ইসতিহসান আছে যেখানে কতিপয় নাস্, গৃহীত প্রথা, দ্বারুরাহ (Doctrine of necessity) (প্রয়োজনীয়তা) অথবা মাস্লাহা (مَصْلَحَة-জনস্বার্থ) ইত্যাদির ভিত্তিতে সাম্য (equity) এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে ব্যতিক্রমকেই সাধারণ বিধান হিসাবে ধরে নেয়া হয়।

আল শাফিঈ কোরআনের ৪:৫৯ এবং ৭৫:৩৬ নং আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে ইসতিহ্সানের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ আয়াতদ্বয় ইসতিহসানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নয়। আল্ গাযালী ইসতিহ্সানের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেন যে শাফিঈ মাযহাবে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসতিহসানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আল আমিদি (একজন শাফিঈ আইনবিদ) উল্লেখ করেন যে, শাফিঈ ইসতিহসানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আধুনিক আইনবিদেরা উল্লেখ করেন যে, ইসতিহসানের আবশ্যিক স্বীকৃতি অস্বীকার করার উপায় নেই।

www.pathagar.com

মাসলাহা মুরসালাহ্

মাসলাহা মুরসালাহ্ (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ):

শাব্দিক অর্থে মাসলাহা (مَصْلَحَة) অর্থ উপকার বা লাভ। যখন শব্দটি মাস্‌লাহা মুরসালাহ (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَة) হিসাবে বিশেষায়িত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় অবারিত জনস্বার্থ। মাসলাহা মুরসালাহ ইসতিস্‌লাহ্‌র প্রতিশব্দ এবং এটি মাস্‌লাহা মুতলাকা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইমাম গাযালী (রা) মনে করেন মাসলাহা পাঁচটি বিষয়কে ধারণ করে যা সংরক্ষণ করে জীবন, ধর্ম, বুদ্ধিবৃত্তি, বংশ ও সম্পত্তি এবং এ উপাদানগুলি উপকারকে সংরক্ষণ করে এবং হারামকে প্রতিরোধ করে।

মাসলাহার ভিত্তিতে তাবেয়ীনরা মুদ্রা প্রণয়ন, জেলখানা স্থাপন এবং খারাজ (খাজনা) আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উসুলবিদগণ ইসতিসলাহর ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন যে ইবাদতের বিষয়ে এবং শরীয়াহর কোনো সুনির্দিষ্ট হুকুমের ক্ষেত্রে, যেমন উত্তরাধিকার আইন, ইসতিসলাহর প্রয়োগ নেই। অধিকাংশ ওলামা মনে করেন ইসতিসলাহ আইন প্রণয়নের একটি যথার্থ ক্ষেত্র। আল কাতাবি দেখান যে এটি সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতের উদ্দেশ্য সাধন করে যেখানে বলা হয়েছে, "আমরা তোমাকে জগদ্বাসীর রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"। মাসলাহার সমর্থনে কোরআনের ৫:৬ আয়াতের উল্লেখ করা যায়। ওলামারা মাসলাহার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদিসমূহ উল্লেখ করেন :

১. ইসলামে কোনো অসুবিধা আরোপিত হবে না বা সহ্য করা হবে না।
২. দুটো বিকল্পের মধ্যে রাসূল (সা) সহজটিকে গ্রহণ করেন যতক্ষণ না এটি পাপের কারণ হয়।
৩. আল্লাহতায়ালা তাঁর দেয়া কঠোর বিধি পালনের ন্যায় সুবিধাজনক বিধিও মানুষ উপভোগ করছে এটা দেখতে ভালোবাসেন।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এটা নিশ্চিত করে যে, আহকাম কায়েম করার নামে কোনো অপ্রয়োজনীয় কঠোরতার অনুমোদন নেই এবং মুসলিমদের উচিত শরীয়াহ প্রদত্ত নমনীয়তা এবং সুবিধা গ্রহণ করা।

সকল খোলাফায়ে রাশেদীন মাসলাহার উপর আমল করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রা) কোরআনকে সংকলন করেন। হযরত ওমর (রা) সরকারি অফিস অপব্যবহার করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের দায়ী করেন। হযরত উসমান (রা) কোরআন শরীফের সঠিক নকল বণ্টন করেন এবং ভিন্নতা সম্পন্ন পাঠের নকল পুড়িয়ে ফেলেন। হযরত আলী (রা) কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের জিম্মায় থাকা দ্রব্য হারিয়ে গেলে তাদেরকেই তার জন্য দায়ী করেন।

www.pathagar.com

অধিকাংশ ওলেমা কর্তৃক মাসলাহার (مَصْلَحَة) পক্ষাবলম্বন করা হয়। যাইহোক, মাস্‌লাহার পক্ষে সবচেয়ে শক্ত সমর্থন প্রদান করেছেন ইমাম মালিক। ইমাম শাতিবি এবং অন্যান্য আরো কতিপয় ওলামার মতে মাস্‌লাহা তিন প্রকার। যথাঃ

১. প্রয়োজনীয় (ضَرُوْرِيَّة-দ্বরুরিয়াত)

২. সুবিধাদায়ক (হাজিয়াত)

৩. সৌন্দর্যদায়ক (تَحْسِيْنِيَّات-তাহসিনিয়াত)

মাসলাহাকে নিম্নরূপ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ

ক. মাসলাহা মুতাবারা (নির্ভরযোগ্য মাসলাহা) ঃ এই মাসলাহা শরীয়তের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, মালিকানা রক্ষার জন্য চোরকে শাস্তি দেয়া।

খ. মাসলাহা মুরসালাহ ঃ এই ধরনের মাসলাহাকে শরীয়ত সবক্ষেত্রে গ্রহণও করেনি বা সবক্ষেত্রে পরিত্যাগও করেনি। এর উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম দেশসমূহে প্রবর্তিত ঐ সমস্ত দলিলাদি যা বিবাহ অথবা সম্পত্তির মালিকানা প্রমানের জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে।

গ. মাসলাহা মুলগাহ্ ঃ এই ধরনের মাসলাহা সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

মাসলাহাকে বৈধতা দেবার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবেঃ

১. মাস্‌লাহা অবশ্যই অকৃত্রিম হতে হবে।

২. মাস্‌লাহা অবশ্যই সার্বজনীন হতে হবে (كُلِّيَة -কুল্লিয়াহ)

৩. মাস্‌লাহ অবশ্যই স্পষ্ট নাস-এর (text) সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

আল তুফি তাঁর বই "মাসাহিল আল মুরসালাহ" তে উল্লেখ করেছেন যে, ইবাদতের ক্ষেত্র ব্যতীত অথবা শরীয়াহর সুনির্দিষ্ট হুকুম ছাড়া মাসালিহ (مَصَالِحْ-মাস্‌লাহার বহুবচন) অন্যান্য প্রমাণের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। তবে অধিকাংশ ওলামা এ মত সমর্থন করেন না।

কিয়াস, ইসতিহসান, ইসতিসলাহ ইত্যাদির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বর্ণনা করতে যেয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কিয়াস এবং ইসতিহসান আবশ্যিকভাবে নুসুসের (text) ইল্লাতের উপর নির্ভরশীল। নুসুসের ইল্লাতের উপর ভিত্তি করে কিয়াস ও ইসতিহ্‌সান দ্বারা আইনের সম্প্রসারণ ঘটে। কিন্তু যখন উল্লিখিত প্রকারে আইন তৈরি সম্ভব হয় না তখন মাস্‌লাহার ভিত্তিতে বা জনস্বার্থে আইন তৈরি করতে হয়। একদল বিশেষজ্ঞ এ পদ্ধতিতে আইন তৈরির তীব্র বিরোধী। কিন্তু এ মতভুক্ত ওলামারা সংখ্যালঘিষ্ঠ এবং তাদের যুক্তিও তেমন জোরালো নয়। ড. হাশিম কামালীর মতে পরিবর্তনশীল বিশ্বের নতুন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী আইনবিদদের জন্য মাস্‌লাহা হচ্ছে একটি অন্যতম হাতিয়ার।

www.pathagar.com

উরফ এবং ইসতিসহাব

উরফ (عُرْف-প্রথা):

উসুল সাহিত্যে উরফকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে পুনঃসংঘটনশীল অনুশীলন হিসাবে যা জনসাধারণের নিকট প্রকৃতিগত দিক থেকে উত্তম বলে স্বীকৃত। উরফ এবং এটা থেকে আহরিত 'মারুফ' (مَعْرُوْف) দুটো শব্দই কোরআন শরীফে মূলত ভালো (মন্দের বিপরীত) এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে (৩ ঃ ১১০ এবং ৭ : ১৯৯)। তবে কোরআনের কতিপয় স্থানে উরফ শব্দটি প্রথা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে (২:২৩৩; সন্তান প্রতিপালনার্থে)। শরীয়াহ তাই নীতিগতভাবে প্রথাকে হালাল এবং হারাম নির্ধারণের জন্য বৈধতা দিয়েছে। ফিকাহবিদরা উরফকে শরীয়াহর আহকাম নির্ধারণের জন্যও গ্রহণ করেছেন। ফিকাহ ঐ সকল বিধান যা আইনবিদদের মতামত বা ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, দেখা গেছে প্রায় বিধানগুলো গঠিত হয়েছে প্রচলিত প্রথার আলোকে। তাই সময়ের প্রেক্ষিতে যদি প্রথাগুলো পরিবর্তিত হয় তবে উক্ত প্রথার আলোকে গঠিত বিধানগুলোর পরিবর্তন করার অনুমতি শরীয়াহতে আছে।

কতিপয় ফুকাহা (فُقَهَاء) (ইমাম সুয়ূতি এবং সারাখসি) একটি নীতির উল্লেখ করেছেন বিবেচনার জন্য। সেটা হলো "প্রথার মাধ্যমে যা প্রমাণিত তা শরীয়তের মাধ্যমে প্রমাণিতের সদৃশ"। এ বিধানটি তুরস্কের শাসক *আল মাজাল্লাহর* সময় গৃহীত হয়েছিল। তবে এই বিধানটি মুসলিম দেশসমূহের প্রথার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং যদি প্রথাটি শরীয়াহর অন্যান্য বিধান এবং সারবত্তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। অমুসলিম সমাজের প্রথা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিরীক্ষণ করতে হবে।

রাসূল (সা) এর জীবদ্দশায় আরবীয় সমাজে প্রচলিত প্রথা এবং যে সকল প্রথা রাসূল (সা) কর্তৃক বাতিল হয়নি সে সকল প্রথাকে রাসূলের (সা) নীরব স্বীকৃতি হিসাবে ধরে নিতে হবে এবং এ সকল প্রথাকে সুন্নাহ তাকরিরিয়াহ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। দিয়াত (রক্ত মূল্য) পরিশোধ হলো এরূপ একটি উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে হত্যাকারী ব্যক্তির 'আকিলাহ'রা (পুরুষ আত্মীয়) ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে বাধ্য। নারীরা বাধ্য নয়, তবে ইচ্ছা করলে প্রদান করতে পারে।

উরফের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রযোজ্য:

১. এটা অবশ্যই সার্বজনীন এবং পুনঃসংঘটনশীল হতে হবে।

www.pathagar.com

২. কাজকারবার সংঘটনের সময় উরফ অবশ্যই অনুশীলিত হতে হবে, অর্থাৎ অতীতের প্রথার কোনো ভিত্তি নেই।

৩. উরফ অবশ্যই নাস্ বা কোরআন এবং সুন্নাহর স্পষ্ট নাস্ এর লঙ্ঘন হবে না।

৪. উরফ অবশ্যই বৈধ চুক্তির (শরীয়াহ মোতাবেক) বিরোধী হবে না।

উরফ এবং ইজমার মধ্যে পাথর্ক্য আছে। উরফ আবশ্যিকভাবে স্থানীয় বা দেশজ অনুশীলন। অন্যদিকে ইজমা হলো স্থান এবং দেশ নির্বিশেষে ওলামাদের মাঝে ঐক্যমত। উভয়ের মাঝে আরো পার্থক্য আছে তবে সেগুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উরফকে কাউলি (قَوْلِى-মৌখিক) এবং ফিয়লি (فِعْلِى-আচরিত) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কাউলি উরফ জনগণের মাঝে মৌখিক মতৈক্যের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে প্রচলিত অর্থ মূখ্য স্থান দখল করে এবং শাব্দিক অর্থ গৌন স্থানে চলে যায়। ফিয়লি উরফ পুনঃসংঘটনশীল অনুশীলন যা জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত, তার সমন্বয়ে গঠিত হয়।

উরফ কাউলি (عُرْف قَوْلِى) এবং উরফ ফিয়লি (عُرْف فِعْلِى) দুটোই আবার আরো দুটো উপভাগে বিভক্তঃ

১. আল উরফ আল্ আম- (اَلْعُرْفُ الْعَام) সকল স্থানের জনগণ কর্তৃক অনুশীলন।

২. আল উরফ আল খাস (اَلْعُرْفُ الْخَاص) -কোনো নির্দিষ্ট স্থান, এলাকা বা দেশে প্রচলিত অনুশীলন।

عُرْف উরফকে আরো দুইভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। যথাঃ

১. উরফু সাহিহ (عُرْف صَحِيْح) -কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহিহ।

২. উরফ আল ফাসিদ (عُرْف فَاسِد)-কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বৈধ নয়।

ড. জামাল আল বাদাবি উফরকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা: ইতিবাচক, নিরপেক্ষ এবং নেতিবাচক। ইতিবাচক উরফের উদাহরণ হলো মহানুভবতা অথবা আতিথেয়তা। নিরপেক্ষ উরফের উদাহরণ হলো এমন প্রথা যা ইসলামী আইন ও শিক্ষার বিরোধী। ড. জামাল বাদাবি উল্লেখ করেছেন যে কোনো স্থানীয় প্রথা যদি নেতিবাচক হয় তবে তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে উরফ খুব স্পর্শকাতর বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত অধিকাংশ বয়োজ্যেষ্ঠ ইসলামী বিশেষজ্ঞের মতামতের উপর নির্ভর করা। কোরআনের ৭:১৯৯ এবং ২২:৭৮ নং আয়াতদ্বয়ের ভিত্তিতে উরফের ন্যায্যতা ধরে

www.pathagar.com

নেয়া হয়। তবে এ আয়াত এ ক্ষেত্রে কাতঈ নয়। কতিপয় হাদিসও উরফের সমর্থনে উল্লেখ করা হয় তবে এসব হাদিসও উরফের সমর্থনে স্পষ্ট প্রমাণ নয়। উরফ নিজেও এর অধিকারের ব্যাপারে স্বাধীন প্রমাণ নয়। যাই হোক, উরফ ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তাকারি ভূমিকা পালন করে। আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে বিধিবদ্ধ আইনের সংকলন কিছুটা হলেও উরফের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দিয়েছে।

আমরা যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করেছি উরফের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আইন পরিবর্তনযোগ্য। উসুলের পাঠ্য বইয়ে এর সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভবিষ্যতেও যখন প্রয়োজন দেখা দেবে উরফ এবং ইজতিহাদের ভিত্তিতে গঠিত আইনের পরিবর্তন হবে।

উপসংহারে বলা যায়, ইসলামী আইনের উৎস হিসেবে উরফের প্রয়োজনীয়তা আর বেশি দিন থাকবে না। যাই হোক, উরফ মাঝে মাঝে ইসলামী আইনকে বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে এবং প্রয়োগ করতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে খুব সতর্ক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

ইসতিসহাব إِسْتِصْحَاب:

শাব্দিক অর্থে ইসতিহাবের অর্থ হলো সাহচর্য। কিন্তু উসূল আল ফিকহ্তে ইসতিসহাব কোনো ঘটনার অস্তিত্বের এবং অনস্তিত্বের অনুমান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য প্রমাণের অনুপস্থিতিতে এটা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সর্বজন কর্তৃক না হলেও অনেক বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইসতিসহাব বৈধতা পেয়েছে। ইতিবাচক অর্থে ইসতিসহাব হলো কোনো ঘটনার (বিবাহ কিংবা উত্তরাধিকার হস্তান্তর) ধারাবাহিকতার অনুমান করা, যদি না বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়। যাই হোক, ধারাবাহিকতার অনুমান প্রমাণিত নাও হতে পারে যদি চুক্তি ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির হয় (ইজারা)। ইসতিসহাব অবশ্য নেতিবাচক ঘটনার ধারাবাহিকতাও অনুমান করে।

যেহেতু ইসতিসহাবের ভিত্তি অনুমান নির্ভর, তাই ইসতিসহাব শরীয়াহর আইন প্রণয়নের কোনো শক্তিশালী ভিত্তি নয়। ফলে ইসতিসহাবের সাথে অন্যান্য প্রমাণের বিরোধ দেখা দিলে অন্যান্য প্রমাণ প্রাধান্য পাবে। ইসতিসহাব চার প্রকারের:

১. ইসতিসহাব আল আদম আল আসলি (إِسْتِصْحَاب اَلْعَدَم الأصْلى- অনুপস্থিতির অনুমান) যার অর্থ একটি ঘটনা বা বিধান যার অস্তিত্ব অতীতে ছিল না। সেটার অনুপস্থিতিটাই ধরে নেয়া হবে।

২. ইসতিসহাব আল ওজুদ আল আসলি (إِسْتِصْحَابُ اَلْوُجُوْدُ الْاَصْلى- উপস্থিতির অনুমান) যার অর্থ কোনো ঘটনার উপস্থিতি ধরে নিতে হবে যা

www.pathagar.com

আইন বা যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত বা প্রমানিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন স্বামী বৈধ বিবাহের প্রমাণের কারণে মোহর দিতে বাধ্য।

৩. ইসতিসহাব আল হুকুম (إِسْتِصْحَابُ الْحُكْمِ) যা আইনের বিধানের এবং মূল নীতির ধারাবাহিকতার অনুমান করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো আইনের রায় দেয়া হয় তখন ধরে নেয়া হয় নতুন রায়টি পূর্বের ধারাবাহিকতার আলোকেই হয়েছে। যখন কোন বিষয়ে একটি আইন বলবৎ থাকে সেটা (অনুমোদন বা নিষেধাজ্ঞা যে ব্যাপারেই হোক) এটা ধরে নেয়া হয় যে আইন অব্যাহত রয়েছে।

৪. ইসতিসহাব আল ওয়াসফী (إِسْتِصْحَابُ الْوَصْفِى-গুণ অব্যাহত থাকা) অর্থাৎ কোন গুণ অব্যাহত রয়েছে ধরে নেয়া যতক্ষন না বিপরীতটি প্রমানিত হয়। যেমন ঃ যে পানিকে বিশুদ্ধ জানা আছে, তাকে বিশুদ্ধ মনে করতে হবে যতক্ষন না বিপরীতটি প্রমানিত হয়।

উসুলের ওলামাদের মাঝে ইসতিসহাবের প্রথম তিনটি ধরন নিয়ে মতৈক্য আছে, তবে চতুর্থ ধরনটি নিয়ে আছে মতদ্বৈততা। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনগত স্বতঃসিদ্ধতা ইসতিসহাবে দেখা যায়। যেমনঃ

১. সন্দেহের দ্বারা নিশ্চয়তার অনুমোদন হয় না।

২. বাধ্যবাধকতা থেকে উৎপত্তিগত স্বাধীনতার অনুমান।

অন্যতম আইনবিদ হাসান রচিত 'তাজদিদ উসুল আল ফিকহ আল ইসলাম' গ্রন্থে ইসতিসহাবের গুরুত্বাবলীর বিষয়ে আলোপকপাত করেন। তার মতে ইসতিসহাবের পরিধির মাঝে প্রাকৃতিক বিচারে (natural law) ধারণা, বৈধ প্রথা এবং সমাজের আরো কিছু বিষয় আত্মস্থ করার কার্যকর ক্ষমতা বিদ্যমান।

www.pathagar.com

সাদ্দ আয্ যারাই'

ذريعة যারীয়া শব্দের বহুবচন যারাই, যার অর্থ মাধ্যম। সাদ্দ অর্থ প্রতিবন্ধকতা তৈরি। উসুল শাস্ত্রে *সাদ্দ আল যারাই* এর অর্থ দাঁড়ায় 'পাপের মাধ্যমকে প্রতিহতকরণ'। সাদ্দ আল যারাই প্রায়ই ব্যবহৃত হয় যখন কোনো বৈধ মাধ্যমের দ্বারা অবৈধ ফলাফলেরর সম্ভাবনা প্রকাশ পায়।

দুষ্কর্ম কার্যকর হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ হওয়া বাঞ্ছনীয় এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই সাদ্দ আল ধারাইয়ের ধারণা গঠিত হয়েছে। কোরআনে সাদ্দ আল যারাইয়ের উদাহরণ আছে (২:১০৪, ৬:১০৮)। মাধ্যম অবশ্যই লক্ষ্যের (শরীয়াহর উদ্দেশ্য) সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে এবং লক্ষ্য অবশ্যই মাধ্যমের উপর প্রাধান্য পাবে। মাধ্যম যদি শরীয়াহর উদ্দেশ্য পরিপন্থি কাজ করে তবে তাকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। শরীয়াহর পাঠ্য থেকে এর উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ সম্ভব।

আইনবিদরা একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করেছেন তা হলো 'হারামের প্রতিবন্ধকতা' কারণ 'উপকার লাভের' উপর প্রাধান্য পাবে। যদি কোনো মাধ্যম পাপকে প্ররোচিত করে তবে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। সাদ আল ধারাইয়ের অনুমতি সুন্নাহতেও দেখা যায়। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা) ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উপহার নিতে বারণ করেছেন (এটা সুদ গ্রহণের দিকে প্ররোচিত করতে পারে)। একই ভাবে তিনি উম্মতের মধ্যে সংঘর্ষ হতে পারে, এ কারণে তিনি মুনাফিকদের হত্যা করা নিষেধ করেন, তেমনিভাবে তিনি সন্দেহের বশে যে কোন হত্যা নিষিদ্ধ করেন।

উপরে উল্লিখিত বক্তব্য সত্ত্বেও উসুলের আলেমগণ সাদ আল যারাইয়ের ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। কেউ কেউ এটার স্বীকৃতি দিয়েছেন আবার অনেকে স্বীকৃতি দেননি। যাইহোক, ইমাম শাতিবীর (রঃ) মতামত হলো অধিকাংশ ওলামাই সাদ্দ আল যারাইকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছেন। আবু যাহরারও মতামত একই ধরনের।

অন্যায়ের দিকে প্ররোচনার সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে *যারাইকে* চারভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

১. সে সকল মাধ্যম, যা নিশ্চিতভাবে পাপের দিকে প্ররোচিত করে। এ রকম মাধ্যম সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ।

২. সে সকল মাধ্যম, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই উপকার নিশ্চিত করে। এর উদাহরণ হলো যুদ্ধকালীন সময়ে

www.pathagar.com

সমরাস্ত্র বিক্রি এবং মদ তৈরিকারকের নিকট আঙ্গুর বিক্রি করা। অধিকাংশ ওলামা এ সকল কাজ করা নিষেধ করেছেন।

৩. সে সকল উপকরণ, যা পাপের দিকে প্ররোচিত করতে পারে, কিন্তু এর কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং প্রবল সম্ভবানাও নেই। এ ধরনের মাধ্যমে অবৈধকরণের ক্ষেত্রে ওলামাদের মাঝে ব্যাপক পর্যায়ের মতদ্বৈততা আছে।

৪. সে সকল মাধ্যম যা কদাচিৎ পাপের পথে পরিচালিত করে। কোনো স্থানে কূপ খনন বা স্বৈরশাসকের উপস্থিতিতে সত্যকথন। ওলামাগণ এ সকল মাধ্যমের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তারা এ সকল কাজকে বৈধ বলেছেন।

সাদ্দ আল যারাই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, বিশেষত উপরে উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণীভুক্ততো নয়ই। এর ব্যাপক ব্যবহারে মুবাহকে (مُبَاح-আইন সম্মত) এবং মানদুবকে (مَنْدُوْب–সুপারিশকৃত) বেআইনি করা হবে, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ইবনুল আরাবী এবং আবু যাহরা সাদ্দ আল যারাই (سَدُّ الذَّرَائِع) ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতি। মানুষের চরমপন্থা প্রবণতার কারণে সাদ আল যারাই ব্যবহারের ফলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা হরণ হতে পারে, যা কোনোভাবেই হতে দেয়া যেতে পারে না।

www.pathagar.com

হুকুম্ শারঈ

হুকুম শারঈ (حُكْمُ شَارِع) : হুকুম্ শাঈ হলো আইন দাতার (আল্লাহপাক স্বয়ং এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (সা) পক্ষে একটি বার্তা, যা মুকাল্লাফের (مُكَلَّف যার উপর আইন প্রয়োগযোগ্য, একজন সুস্থ এবং বয়স্ক ব্যক্তি) আচরণ সম্পর্কিত, তার গুরুত্ব কি পর্যায়ের তা কি বাধ্যতামূলক, পছন্দীয় না মুবাহ, অপছন্দনীয় না হারাম।

যদি বার্তাটি (text) আইন বিধিবদ্ধ করে তবে তা হবে হুকুম আলতাকলিফি (حَكْمُ التَّكْلِيْف)। আল হুকুম তাকলিফ (اَلْحُكْمُ التَّكْلِيْف) হুকুমটি ভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা, ফরজ (فَرْض), ওয়াজিব (وَاجِب), মান্দুব (مَنْدُوْب), মুবাহ (مُبَاح), মাকরুহ এবং (حَرَام) হারাম। অধিকাংশের মতে (فَرْض) ফরজ এবং (وَاجِب) ওয়াজিব পরস্পর প্রতিশব্দ। যদি আইন দাতার নিকট থেকে কিছু করার জন্য বাধ্যতামূলক দাবি থাকে তখন তাকে ওয়াজিব বলে। হানাফী মাযহাবে এটিকে ফরজ বলা হয়। হানাফীদের নিকট ওয়াজিব অন্য এক ধরনের বিধান যার পাঠ বা অর্থের কোনো একটি যান্নি পর্যায়ভুক্ত হয়। কোনো দাবিকে তখনই ফরজ আখ্যায়িত করা হয় যদি পাঠ্য এবং এর অর্থ উভয়ই কাতঈ হয় আর একে ওয়াজিব পর্যায়ভুক্ত করা হয়, যদি পাঠ বা এর অর্থের কোনো একটি যান্নি পর্যায়ভুক্ত হয়।

উপরে উল্লিখিত ওয়াজিব, যা হানাফীদের নিকট ফরজ এমন প্রমাণের ভিত্তিতে গঠিত কোনো বাধ্যতামূলক আদেশের অস্বীকার অবিশ্বাস্য এর পর্যায়ে পড়ে। আর ওয়াজিবের অস্বীকার বিদ্রোহের পর্যায়ে পড়ে। বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ নিম্নোক্ত পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করা যায়:

১. ওয়াজিব আইন (وَاجِبُ عَيْن-সকল মুকাল্লাফের উপর ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা) এবং ওয়াজিব কিফায়া (সম্মিলিত বাধ্যবাধকতা, সমাজের একাংশের দ্বারা সম্পাদিত হলেই যথেষ্ট)।

২. ওয়াজিব মুওয়াক্কাত (وَاجِب مُؤَقَّت-সময়সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ, যেমন নামাজ এবং রোজা) এবং ওয়াজিব মুতলাক (শর্তহীন ওয়াজিব যা কোনোরকম সময় দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়) যেমন হজ্ব।

৩. ওয়াজিব মুহাদ্দাদ (وَاجِب مُحَدَّد-পরিমাপযোগ্য ওয়াজিব, যেমন যাকাত এবং নামাজ) এবং ওয়াজিব গাইর মুহাদ্দাদ (وَاجِب غَيْرُ مَحَدَّد অপরিমাপযোগ্য ওয়াজিব, যেমন গরীব দুঃখীকে দান, স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান)।

মান্দুব (مَنْدُوْب-সুপারিশকৃত) : মান্দুব এমন ধরনের দাবি যা মুকাল্লাফের (مُكَلَّف) উপর বাধ্যতামূলক নয়। মান্দুব মানলে আত্মিক পুরস্কার পাওয়া যায় তবে পালনে ব্যর্থ হলে কোনোরূপ শাস্তি আরোপিত হয় না। ওয়াজিব এবং

www.pathagar.com

মান্দুবের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। মান্দুবের উদাহরণ হলো ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা, গরীব দুঃখীর জন্য দান খয়রাত ইত্যাদি। মান্দুবের মধ্যে এই হলো পার্থক্য। মান্দুবকে সুন্নাহ, নফল এবং মুস্তাহাবও বলা হয়।

সুন্নাহকে (مَنْدُوْب-মান্দুব) নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

১. সুন্নাহ আল মুয়াক্কাদাহ (اَلسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَة) জাতীয় উদাহরণ হলো আজান, জামাতে নামাজে অংশগ্রহণ।

২. সুন্নাহ গাইর আল মুয়াক্কাদাহ (اَلسُّنَّةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَة-অতিরিক্ত সুন্নাহ)-এর উদারহণ হলো নফল নামাজ, বাধ্যতামূলক নয় এমন দান খয়রাত।

৩. সুন্নাহ আল মুয়াক্কাদাহর (اَلسُّنَّةُ الْمُؤَكَّدَة-অবজ্ঞা নিন্দনীয় তবে শাস্তিযোগ্য নয়। সুন্নাহ গাইর আল মুয়াক্কাদাহর– (اَلسُّنَّةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَة অবজ্ঞা নিন্দনীয় কিংবা শাস্তিযোগ্য কোনোটিই নয়। কোরআনে মান্দুবের উদাহরণ দেখা যেতে পারে ২:২৮২ এবং ২৪:৩ আয়াতে।

মাহজুর (مَحْجُوْر হারাম) : মাহজুর হলো আইনদাতা কর্তৃক মুকাল্লাফের (مُكَلَّف) প্রতি কোনো কিছু বাধ্যতামূলকভাবে না করার দাবি। কোনো কিছু নিষেধ করার জন্য ওয়াজিবের (উসুলের অধিকাংশ ওলামা কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত) সমপর্যায়ের প্রমাণের প্রয়োজন। অর্থাৎ তার পাঠ (text) এবং অর্থ কাতঈ হতে হবে।

হারামের পাঠগত প্রমাণ নানাভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। যেমন:

এটা আরম্ভ হতে পারে "হুররিমাত আলাইকুম" (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ) নিষেধ তোমাদের প্রতি (৫:৩)।

এটা একটি নেতিবাচক শব্দ ও (Verb of Negetive Command) প্রদান করতে পারে। যেমন "লা তাকতুলু" (لَاتَقْتُلُوْا হত্যা করো না), "লা তা'কুলু" (لَاتَاْكُلُوْا খেয়ো না এবং নিও না [২:১৮৮]

কোনো কিছু পরিহার করার আদেশ সূচকও হতে পারে (৫:৯০; মদ ও জুয়া পরিহার করতে)।

বিষয়টি অনুমোদনযোগ্য নয় এভাবেও সূচনা হতে পারে লা ইয়াহেল্লু লাকুম, (لَايَحِلُّ لَكُمْ-৪:১৯)।

কোনো আচরণের জন্য শাস্তি প্রদানের ঘোষণা দিয়েও নিষেধাজ্ঞা হতে পারে। কোরআনের হুদুদ সংক্রান্ত আয়াত এবং সে সকল আয়াত যেখানে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা আছে।

নিষেধাজ্ঞাকেও নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় :

www.pathagar.com

হারাম লি যাতিহি (حَرَامٌ لِذَاتِهِ) যা তার নিজের কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন মদ, জুয়া)।

হারাম লি গাইরিহি (حَرَام لِغَيْرِهِ) যা বাহ্যিক কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। যেমন অন্য মানুষের সাথে বিয়ের বৈধতা প্রদানের জন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করা।

মাকরুহ (مَكْرُوْه) হলো মান্দুবের (مَنْدُوْب) বিপরীত। এটা করার চেয়ে না করা ভালো। মাকরুহ কাজ করা শাস্তিযোগ্য বা নৈতিক দোষের বিষয় নয়। অধিকাংশের এটাই মতামত। হানাফীরা অবশ্য মাকরুহকে নিম্নোক্ত দুইভাগে ভাগ করেছে:

মাকরূহ তানজিহি (مَكْرُوْه تَنْزِيْهِى) এবং **মাকরূহ তাহরিমি** (مَكْرُوْه تَحْرِيْمِى) হানাফীদের মতে মাকরুহ তাহরিমি নৈতিক দোষের কারণ, যদিও তা শাস্তিযোগ্য নয়।

মুবাহ (مُبَاح) হালাল বা জায়েয) আইনদাতার একটি বার্তা যা মুকাল্লাফকে সুযোগ দেয় (২:১৭৩; ২:২৩৫; ৫:৬)। উসুলের ওলামাগণ মুবাহকে হুকুম শারঈর অন্তর্ভুক্ত করেছে যদিও তা সম্পাদনের জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

আল হুকুম আল ওয়াদি :

যে বিধান দ্বারা বাধা, শর্ত ইত্যাদি আরোপ করা হয়। এখানে কোনো আইনকে নির্দিষ্টকরণ করতে যেয়ে কোনো কিছুকে কারণ, কোনো কিছুকে শর্ত বা বাধা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এ জাতীয় হাদিসের উদাহরণ হলো যেখানে বলা হয়েছে, "দুজন সাক্ষী ব্যতীত কোনো বিবাহ হবে না" -এক্ষেত্রে বৈধ বিবাহের জন্য দুজন সাক্ষীকে শর্ত হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে আরেকটি হাদিসের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বলা হয়েছে, "উত্তরাধিকারীদের জন্য কোনো ওছিয়ত (will) কার্যকর নয়। এখানে ওয়ারিসদের ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করা হয়েছে। হুকুম আল ওয়াদি বা ঘোষণাকৃত আইনকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

১. কারণ।
২. শর্ত।
৩. আজিমাহ (عَزِيْمَة)
৪. রুখসাহ (رُخْصَة) এবং
৫. মা'নি (প্রতিবন্ধকতা)

আজিমাহ হলো এমন ধরনের আইন যেখানে আইন প্রণেতার ইচ্ছা হলো কোনো কারণবশত কোনোরকম নমনীয়তা প্রদর্শন ছাড়াই আইনটি কার্যকর করা (সাধারণ পরিস্থিতিতে সকল প্রকারের ইবাদত)।

www.pathagar.com

রুখসাহ্ হলো সমস্যাজনিত কারণে আইনটির ব্যতিক্রম (ভ্রমণজনিত কারণে রোজা ভঙ্গের অনুমতি)। রুখসাহ তিনটি কারণে ঘটতে পারে। যথা:

১. প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে কোনো নিষিদ্ধ কাজের অনুমতি।

২. ওয়াজিব প্রতিপালন কষ্টের কারণ হলে ওয়াজিবের রহিতকরণ (ভ্রমণের সময় ভ্রমণকারীদের নামাজের সংক্ষিপ্তকরণ এবং রোজার স্থগিতকরণ)।

৩. যে চুক্তি সাধারণভাবে বৈধ নয় তাকে বৈধতা প্রদানের ক্ষেত্রে। যেমন অগ্রিম বিক্রি (বাইয়ে সালাম) এবং উৎপাদিত হয় নাই এমন উৎপাদনজাত পণ্যের জন্য ক্রয় আদেশ (ইসতিসনাহ)।

এর বাইরেও শরীয়াহর আইনের আরো বিভাজন আছে। যেমন

১. সহীহ (صَحِيْح -বৈধ)।

২. ফাসিদ (فَاسِد -অনিয়মিত)।

৩. বাতিল (بَاطِل -বাতিল)।

উপরোক্ত শ্রেণী বিভাজন হয়েছে অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার (আরকান-أَرْكَان) এবং আহকামের (শর্তের شَرْط) উপর ভিত্তি করে। যখন আরকান ও আহকাম পূরণ হয় তখন সে কাজকে বৈধ বা সহীহ বলে। এটি পূরণ না হলে কাজটি বাতিল বলে বিবেচিত হয়।

ওলামারা এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, ইবাদত শুধুমাত্র সহীহ (صَحِيْح) বা বাতিল (بَاطِل) পর্যায়ভুক্ত হবে। লেনদেনের বিষয়টিও অনুরূপ বলে অধিকাংশ ওলামার অভিমত। তবে হানাফীরা এ দুয়ের মধ্যবর্তী একটি অবস্থাকে বৈধ বলে বিবেচনা করেন যা ফাসিদ বলে অভিহিত। এক্ষেত্রে শর্ত পালনে কিছু ঘাটতি থাকে। পরবর্তী ঘাটতি যদি পূরণ করা হয় তবে ফাসিদ কার্যটি সহীহ বলে বিবেচিত হবে।

হুকুম্ শারঈ এর স্তম্ভ হলো তিনটি। যথা:

১. আইনদাতা (حَاكِم -হাকিম)।

২. বিষয়বস্তু (مَحْكُوْمٌ فِيْه-মাহকুম ফিহ্)

৩. মাহকুম আলাইহ (مَحْكُوْم عَلَيْه-যার উপর আইনটি কার্যকর)

ইসলামে সকল আইনের উৎস শেষ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা (৫:৪৫; ৬:৫৭)। মাহকুম ফিহ্ সেই সকল কাজকে নির্দেশ করে যা মুকাল্লাফের (مُكَلَّف) উপর ওয়াজিব, মান্দুব বা মুবাহ হিসাবে করণীয়। মাহকুম আলাইহে (مَحْكُوْم عَلَيْه) ব্যক্তি পর্যায়ে যারা শরিয়াহ কর্তৃক আরোপিত অধিকার এবং বিধিনিষেধকে মেনে চলে তাদের নিয়ে কাজ করে।

www.pathagar.com

একজন ব্যক্তি যখন নির্দিষ্ট পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা এবং সক্ষমতা অর্জন করে তখন সে কার্যকর আইনি যোগ্যতা অর্জন করে। কার্যকর আইনি যোগ্যতা শিশুর ক্ষেত্রে বয়সের কারণে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য আংশিক পর্যায়ে থাকে।

হুকুম্ শারঈকে আরও দুইভাগে ভাগ করা সম্ভব। যথা:

১. হাক্কুল্লাহ (حَقُّ اللهِ)

২. হাক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَاد)

হাক্কুল্লাহ্‌র ধরন এরূপ যে এর দ্বারা আল্লাহ্ উপকৃত হন না বরং এর দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। অন্য কথায় এটি জনগণের অধিকার। ইবাদত, হুদুদ, উকুবাহ্ (শাস্তি), কাফফারা (كَفَّارَة), জিহাদ (جِهَاد) ইত্যাদি আল্লাহর অধিকারভুক্ত।

হাক্কুল ইবাদ্ হলো বান্দা তথা-আল্লাহর সৃষ্টির অধিকার। যার সংরক্ষণ অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। যেমন কারো গচ্ছিত সম্পদ (আমানত) সংরক্ষণ ও যথা নিয়মে মালিককে সমপর্ণ। খিয়ানত বা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা মহাপাপ। যেমন কারো অর্থ-সম্পদ বা অন্য কোন অধিকার ক্ষুন্ন করা ওয়ারিসকে তার পাওনা না দেয়া ইত্যাদি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে। এমনকি অন্যান্য প্রাণীকূলের ক্ষেত্রেও এ বিধান সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন পরিবেশের ক্ষতি সাধন পূর্বক অন্যায়ভাবে প্রাণীকূলের খাদ্যাভাব ও অশান্তি সৃষ্টি করা।

www.pathagar.com

তা'আরুদ্ব

তা'আরুদ্ব (تَعَارُض)

তা'আরুদ্ব (تَعَارُض সাক্ষ্যসমূহের মাঝে বিরোধ): তাআরুদ মানে বিরোধ। উসুল আল ফিকহে তাআরুদ্ব বলতে বোঝায় শরীয়াহর দুটো প্রমাণ একই শক্তিমত্তা সম্পন্ন, তবে প্রমাণ দুটো পরস্পর বিপরীতমুখী। দুটো প্রমাণের শক্তি যদি অসম হতো তবে এরূপ বিরোধের উদ্ভব হতো না, কেননা সে ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী প্রমাণটিকে দুর্বল প্রমাণের উপর প্রাধান্য দেয়া হতো। এ কারণেই কাতঈ ও যান্নি প্রমাণের মাঝে কোনো বিরোধ নেই।

যদি বিপরীত মতের পক্ষে কোরআনের দুটো আয়াত অথবা কোরআনের একটি আয়াত এবং একটি মুতাওয়াতির হাদিস অথবা দুটো আহাদ হাদিস সাক্ষ্য হিসেবে থাকে তবে বিরোধ দেখা দেয়।

বিরোধ শুধু মাত্র তখনই দেখা দেয়, যদি দুটো প্রমাণের প্রদত্ত রায়ের মাঝে কোনোরূপ সমন্বয় সাধন করা না যায়। অর্থাৎ একটির বিষয়বস্তু থেকে অন্যটির বিষয়বস্তুর ভিন্নতা যদি না করা যায়, কিংবা প্রমাণ দুটোর সময়কালের ভিন্নতা নিরূপণ না করা যায় (অর্থাৎ এটি নিশ্চিত করা যায় না কোন্ প্রমাণটি পরের)।

কাতঈ সাক্ষ্যের মাঝে এরূপ বিরোধ কদাচিৎ ঘটে। বিরাজমান অধিকাংশ বিরোধই বাস্তব নয় বরং প্রতীয়মান। এসব বাহ্য বিরোধ নিরসনের পদ্ধতিসমূহ হলো:

১. সমন্বয়সাধন
২. নির্দিষ্টকরণ
৩. একটির উপর অন্যটিকে অগ্রাধিকার প্রদান।

নাস্ আর ইজমার মধ্যে বিরোধ অচিন্তনীয় কেননা ইজমা কখনো নাসকে লঙ্ঘন করতে পারে না।

একজন মুজতাহিদের অবশ্য করণীয় হলো প্রতীয়মান এসব বিরোধের সমন্বয় সাধন করা। যদি বিবাদমান সাক্ষ্য দুটি দুই পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য হয়, তবে সেভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। যদি এটা সম্ভব না হয় তবে মুজতাহিদকে বিবেচনা করতে হবে উভয়ের মধ্যে কোন্টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে, অর্থাৎ একটিকে গ্রহণ করতে হবে। যদি এ প্রক্রিয়াও সম্ভব না হয় তবে প্রমাণ দুটির সময়কাল পর্যালোচনা করবে এবং তাতে বাতিলকরণের নীতিপ্রয়োগ করতে হবে। এতে পরবর্তী প্রমাণ অগ্রাধিকার পাবে। যদি এ প্রক্রিয়াও সম্ভব না হয় তবে উভয় প্রমাণই বাতিল করতে হবে। যখন বিদ্যমান প্রমাণ দুটির ধরন আম হয় সে ক্ষেত্রে একজনের উচিত সাক্ষ্যটির প্রয়োগের বিষয়বস্তু চিহ্নিত করা (যেমন একটি

www.pathagar.com

বয়স্কদের ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে, অন্যটি কার্যকর হতে পারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে অথবা একটি কার্যকর হতে পারে বিবাহিতদের ক্ষেত্রে, অন্যটি কার্যকর হতে পারে অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে)। একটি সাক্ষ্য যদি হয় আম এবং অন্যটি যদি হয় খাস, তবে, এর সমাধান হলো তাখসিস-আল্-আম্ (আমের কিয়দংশের নির্দিষ্টকরণ)।

প্রতীয়মান বিরোধের কারণে যেখানে দুটো প্রমাণ একই সাথে কার্যকর করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধি অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. স্পষ্ট পাঠ অস্পষ্ট পাঠের উপর প্রাধান্য পাবে।
২. সারিহ (صَرِيْح জটিলতাহীন) পাঠ কিনায়াহ (كِنَايَة দুর্বোধ্য) পাঠের উপর এবং حَقِيْقِى হাকিকি (শাব্দিক) পাঠ মাজাযি (مَجَازِى রূপক) পাঠের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৩. ইবারা আল নাসকে عِبَارَة النَّص ইশারা আল নাসের إِشَارَة النَّص উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. মুতাওয়াতির مُتَوَاتِر হাদিস মাশহুর (مَشْهُوْر) হাদিসের উপর এবং মাশহুর হাদিস আহাদ (أَحاد) হাদিসের উপর অগ্রাধিকার পাবে।
৫. ফকিহ فَقِيْه বা বিশিষ্ট সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদিস অন্যদের উপর প্রাধান্য পাবে।
৬. নিষেধাজ্ঞা অনুমোদনের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

যদি কোনোভাবেই সমন্বয় সাধন বা একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব না হয় তবে সাক্ষ্য দুটিকে বাতিলের পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক্ষেত্রে শারঈ সূত্র হলো-إِذَا تَّعَارَضَا تَسَاقَطَا

অর্থাৎ সম মর্যাদা সম্পন্ন দু'টো প্রমাণ যখন পরস্পর বিরোধীরূপে প্রতীয়মান হবে, তখন দু'টোই বাতিল বলে গণ্য হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বাতিলকরণের বিধান আলোচিত হয়েছে। বিবাদমান দুটো কিয়াসের মাঝে সমন্বয় সম্ভব না হলে একটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

www.pathagar.com

ইজতিহাদ

ইজতিহাদ إِجْتِهَاد : মূল শব্দ জুহ্‌দ্ বা জাহাদা جَهْدَ থেকে ইজতিহাদ إِجْتِهَاد শব্দটি উপজাত। ইজতিহাদ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হলো সংগ্রাম করা বা আত্মপ্রচেষ্টা। ইজতিহাদ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টাকে ধারণ করে। ইজতিহাদ ইসলামিক আইনের একটি ব্যাপক উৎস এবং কোরআন ও সুন্নাহর পরেই এর স্থান।

রাসূল (সা) এর ইন্তিকালের মধ্য দিয়ে কোরআন এবং সুন্নাহ পরিপূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু ইজতিহাদ চলমান বিষয়, নতুন বাস্তবতার সাথে উপযোজন, নতুন বিচার্য বিষয়কে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা এবং কোরআন ও সুন্নাহর সাথে এর সামঞ্জস্যহীনতার কারণে এটি ইসলামী আইনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন উৎস বা পদ্ধতি যা নতুন আইন সৃষ্টি করে।

কোরআন এবং সুন্নাহর বাইরে ইসলামী আইনের উৎস হিসাবে ইজতিহাদই আবশ্যকীয়ভাবে নতুন নতুন আইন রচনা করে। যদি কোরআন এবং সুন্নাহর পাঠে পরিষ্কারভাবে বিধানের উল্লেখ থাকে তখন ইজতিহাদ কার্যকর থাকে না। ইজতিহাদ দ্বারা প্রদত্ত রায় আবশ্যিকভাবে যান্নি প্রকৃতির। ইজতিহাদের বিষয়বস্তু শরীয়াহর প্রায়োগিক বিধান, যা নস্ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়নি। ইজতিহাদ বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব। বিষয়টি যদি জরুরি হয় তবে ইজতিহাদযোগ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য তা বাধ্যতামূলক (ফারদ্ব আল আইন বা ওয়াজিব আল আইন)। যদি বিষয়টি জরুরি না হয় তবে এর সমাধান সমষ্টিগতভাবে দায়বদ্ধ (ফারদ্ব আল কিফায়া বা ওয়াজিব আল কিফায়া)।

একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারে তাকলিদ (تَقْلِيْد -অন্য একজন বিশেষজ্ঞকে অন্ধ অনুকরণ) পরিহার করবেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাকলিদ অনুমোদিত। ইবনে হাযম মনে করেন তাকলিদ কারো জন্যই অনুমোদিত নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যে সামান্য কিছু হলেও অনুসন্ধানের যোগ্যতা রাখে তার জন্য তাকলিদ অনুমোদিত নয়।

ইজতিহাদ কোরআন সুন্নাহ এবং সাহাবীদের চর্চা দ্বারা প্রমাণিত। ইজতিহাদের সমর্থনে কোরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ হলো ৪:৫৯, ৯:১২২; ২৯:৬৯; এবং ৫৯:২। এ সকল আয়াত প্রকৃতিগত দিক থেকে যান্নি ধরনের।

ইজতিহাদের স্বপক্ষে অসংখ্য হাদিসের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলোর মধ্যে দুটো খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রথম হাদিসটি হলো, যেখানে মুআয বিন জাবাল (রা) রাসূল (সা) এর প্রতিউত্তরে বলেছেন, যদি তিনি কোরআন বা হাদিসে সমস্যার সমাধান খুঁজে না পান, তবে ইজতিহাদের দ্বারস্থ হবেন এবং রাসূল (সা) এতে

www.pathagar.com

সম্মতি দিলেন (আবু দাউদ)। দ্বিতীয় হাদিস হলো-যেখানে রাসূল (সা) বলেছেন, একজন মুজতাহিদ দুটো সওয়াব পাবেন যদি তিনি যথার্থ হন, আর একটি সওয়াব পাবেন যদি তিনি ভুল করেন (আবুদ দাউদ)।

ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিষয় কতিপয় বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে কোরআন ও হাদিসে কিছুর উল্লেখ নাই। পঞ্চম শতাব্দিতে আবুল হুসেইন আল বস্‌রী প্রথমবারের মতো মুজতাহিদের যোগ্যতার মাপকাঠির বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং পরবর্তীতে গাজ্জালী ও আমিদি তা গ্রহণ করেন। এটা ঠিক যে ইজতিহাদের জন্য একজন যোগ্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হলো:

১. আরবি ভাষা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান।

২. কোরআন, হাদিস এবং এতদসম্পর্কিত বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে।

৩. পূর্ববর্তী মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত ইজতিহাদ বিষয়ে জ্ঞানী হতে হবে।

৪. শরীয়াহর মাকাসিদ সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।

৫. মুজতাহিদকে অবশ্যই ঋজু প্রকৃতির এবং অবশ্যই সবল ও দুর্বল সাক্ষ্যের মাঝে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে যোগ্য হতে হবে।

এটা অবশ্যই প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনীয় যোগ্যতার মাপকাঠি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু বাস্তব বিষয় তা নয়। একজন একনিষ্ঠ এবং যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসব যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। অধিকাংশ ওলেমা এ মত পোষণ করেন যে, যদি একজন ব্যক্তি একটি ক্ষেত্রে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেন তবে তিনি সকল ক্ষেত্রেই ইজ্‌তিহাদের অধিকার রাখেন। ইজতিহাদের ধরন এমন যে, মুজতাহিদ প্রথমে কোরআন এবং সুন্নাহতে সমাধান খুঁজবেন এবং সেখানে যদি সমাধান না পান তবে তিনি ইজতিহাদের স্মরণাপন্ন হবেন।

অধিকাংশের মতামত হলো ইজতিহাদ ভুল হতে পারে। সংখ্যালঘু অংশ মনে করেন আলাদা রায়ের প্রতিটিই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ঠিক।

মুজতাহিদদের নানানভাবে বিভাজন করা সম্ভব। তবে অনেকে মুজতাহিদদের বোঝার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাজন করেছেন। মৌলিক শ্রেণী বিভাজন হলো নিম্নরূপ:

১. উল্লেখযোগ্য মুজতাহিদ-যারা নিজেরাই ইজতিহাদের বিধান তৈরি করেছেন এবং ব্যাপক সংখ্যায় ইজতিহাদ করেছেন।

২. অন্যান্য মুজতাহিদ-যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য মুজতাহিদ কর্তৃক প্রণীত ইজতিহাদের বিধি অনুসরণ করেন এবং কিছু ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেছেন।

www.pathagar.com

কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ প্রথম কয়েক শতাব্দি পর আর ইজতিহাদ হবে না বলেছেন। এই মতামত এখন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আল্লামা শাওকানি বলেন, এ মত চূড়ান্তভাবে পরিত্যাজ্য। আল্লামা ইকবালের মতে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দেয়া একটি 'প্রকৃত অলীক কাহিনী'। ইসলামী সভ্যতার ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করছে যোগ্য বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রণীত ইজতিহাদের উপর। ভবিষ্যতে সম্মিলিতভাবে অধিকতর ইজতিহাদ প্রণীত হবে বলে আশা করা যায়।

(ড. হাশিম কামালী-এর "প্রিন্সিপাল অফ ইসলামিক জুরিস প্রুডেন্স" এবং ড. মোহাম্মদ ইকবাল-এর " রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থটস ইন ইসলাম"।)

www.pathagar.com

পরিভাষা

আরবি পরিভাষা	বাংলা অর্থ
দারুরাহ (ضَرُوْرَة)	প্রয়োজনীয়তা (Necessity)
দারুরিয়ায়াত (ضَرُوْرِيَّات)	প্রয়োজনীয়(Necessities)
আসবাব-আল-নুযুল (اَسْبَابُ النُّزُوْل)	আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট
আহকাম (أَحْكَام)	আইন/ বিধান
আসল (أَصْل)	মূল
আকিলাহ	হত্যাকারী ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়বৃন্দ
ইল্লাহ (عِلَّة)	হুকুমের কারণ
ইসনাদ (إِسْنَاد)	হাদীস বর্ণনাকারীদের ধারাক্রম/ পরম্পরা
ইসতিসলাহ	জনগণের স্বার্থ বিবেচনা
ইমতিসহাব	অনুমান (Presumption)
ইসতিহসান (اِسْتِحْسَان)	আইনগত অগ্রাধিকার
ইজমা (إِجْمَاع)	ঐকমত্য
নাসখ (نسخ)	রদ বা বাতিল করণ
নাজম (نَظْمٌ)	পাঠ বা (text)
নুসূস	নাস্ এর বহুবচন
উরফ (عرف)	প্রথা
উরফ কাউলি (عرف قولى)	মৌখিক উরফ
উরফ ফেয়লি (عرف فعلى)	কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত উরফ
উসুল আল ফিকহ্ (أُصُوْلُ الْفِقْه)	উসুল কোরআন ও সুন্নাহর বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি বর্ণনা করে
উসূলিয়ূন (أصوليون)	ইসলামী আইনবিদগণ
খাফি (خفي)	আংশিকভাবে দুর্বোধ্য
ফতওয়া (فتوى)	ফিকহ্বিদদের মত
মা-আনি (معانى)	অর্থ
মাকসিদ (مقصد)	উদ্দেশ্য
মাসআলা (مسئلة)	জনগণের স্বার্থ

www.pathagar.com

মাজায (مجاز)	রূপক
মুনজাবিদ	অপরিবর্তনীয় গুণ
মুনাসিব (مناسب)	মুজতাহিদদের মতে যথার্থ
মুফাস্সার (مفسر)	দ্ব্যর্থহীন
মুকাইয়্যাদ (مُقَيَّد)	শর্তযুক্ত
মুহকাম (محكم)	প্রাঞ্জল
মুতলাক (مُطْلَق)	শর্তহীন
মুতাআদ্দি (مُتَعَدِّى)	অন্যের নিকট হস্তান্তরযোগ্য
মুশকিল শব্দ (مُشْكِل)	যে শব্দের অর্থ দুইটি বা ততোধিক
মুজমাল (مُجْمَل)	বিপরীতধর্মী
মুতাশাবিহ্ (مُتَشَابِهَ)	জটিল
যাহির (ظَاهِر)	প্রতীয়মান/ সুস্পষ্ট
রায় (رَأى)	ব্যক্তিগত মতামত
কাতঈ (قطعِى)	নিশ্চিত, পরম বা চরম, ব্যতিক্রমহীন, স্পষ্ট
কাতি (قطعِى)	নিশ্চিত
খাস (خَاص)	বিশেষ / সুনির্দিষ্ট
সনদ (سَنَد)	হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাক্রম
হাকিকি (حَقِيقِى)	শাব্দিক / আসল
যান্নি (ظَنِّى)	অনুমানগত
হুদুদ (حُدُوْد)	কোরআন ও সুন্নাহতে যে শাস্তির উল্লেখ আছে
হুকুম (حُكْم)	বিধান
দিয়াত (دِيَةٌ)	মৃত্যু জনিত ক্ষতিপূরণ
কিয়াস (قِيَاس)	সাদৃশ্যতার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
তানকিহ আল মানাত্ব	ইল্লাহকে স্বতন্ত্রকরণ
তাহসিনিয়াত (تَحْسِينِيَّات)	সৌন্দর্যদায়ক
তালিল (تَعْلِيْل)	আহকামের কার্যকরণ নির্ধারণ
তা'যীর	পার্লামেন্ট বা কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি/শরীয়াহ নির্ধারিত শাস্তির অতিরিক্ত

www.pathagar.com

গ্রন্থ পাঞ্জি

১. 'প্রিন্সিপালস অব ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স,' ডঃ মুহাম্মদ হাশিম কামালি, দি ইসলামিক টেক্সট সোসাইটি, ৫ গ্রীণ স্ট্রিট, ক্যামব্রিজ, সিবি২ ৩ জেইউ, ইউকে, ১৯৯১।

২. 'দি ডকট্রিন অব ইজমা ইন ইসলাম,' আহমদ হাসান, ইসলামিক রিসার্চ ইনিস্টিটিউট, ইসলামাবাদ, ১৯৭০।

৩. 'দি ফিলোসফি অব জুরিসপ্রুডেন্স ইন ইসলাম,' সবহি রাজব মাহমাসানি, ই.জে. ব্রিল, লিইডেন, ১৯১১।

৪. উসুল আল ফিকহের উপর রচিত বিভিন্ন বই এবং নিবন্ধ, ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানি, আইআইআইটি, ইউএসএ।

৫. উসূলুল ফিকহ, আবু যাহরা, ড. আল ফিকর আল আরাবী, কায়রো, ১৯৫৮।

৬. ইলমু উসূলিল ফিকহ, আব্দ আল ওয়াহাব খাল্লাফ, দার আল কালাম, কুয়েত, ১২তম সংকলন, ১৯৭৮।

৭. উসূলুল ফিকহ, শাইখ মুহাম্মদ আল খুদ্বারী, দার আল ফিকহ, কায়রো, ১৯৮১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984-33-2353-X